অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু

এই লেখকের

কিংবদন্তীর নায়ক	সবুজ নক্ষত্র
অসবর্ণ	উত্তর জাহ্নবী
কামনার সুখ দুঃ	বিমূর্ত পাপ
অন্ধ ত্রাস	বনকরবী
মায়ামৃদঙ্গ	জলতরঙ্গ
নিষিদ্ধ প্রান্তর	ছায়া পড়ে
এখন অন্ধকার	নিশিলতা
বন্যা	তৃণভূমি

বাস-রাস্তার ধারে বিশাল শিরিষ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রমহিলা। ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখছিলেন বার বার। বেশ ছিমছাম সপ্রতিভ চেহারা, হালকা নিটোল গড়ন। কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায় এমন ধরনের ফরসা প্রচণ্ড রূপসী এবং চোখে গগলস প্রচুর দেখেছি, গাড়ি থেকে নেমে যাঁরা বিদ্যাসুন্দরীয় ত্রিপদী ছন্দে কেনাকাটায় এগিয়ে যান এবং হাওয়ায় রেখে যান দুর্মূল্য সুরভি ও চোখগুলিতে সেক্স।

দেখা অবধি আমার মনে কেবল কলকাতা শহরের ওই চৌহদ্দী আর রাস্তা দোকানপাট মানুষজন ইত্যাদি ভাসছিল। কোথায় দাঁড়িয়ে এবং কেন, একটুও মনে ছিল না। সুন্দরীর চারপাশে বাতাসে একটা কড়া সুগন্ধ ভাসছিল।

আমিও বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। একটু আগে রাণীহাট থেকে এবড়ো-খেবড়ো খোয়াভরা সরু রাস্তায় দুদিকে ফাঁকা কয়েক একর জমি পেরিয়ে আসতে আসতে বীরেশ্বরের ওপর চাপা ক্ষোভটুকু মনে ছিল। বড়-রাস্তায় পৌঁছে এই ভদ্রমহিলাকে দেখার পর সেটুকু ভুলে গিয়েছিলুম।

উৎকট গরম পড়েছে। ফ্যানের বাতাসেও সারাটা রাত ভাল ঘুম হয় নি। নতুন জায়গা, তার ওপর মনে উত্তেজনা—শেষ রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে থাকব। বীরেশ্বর খুব সকালে ওঠে। সে জাগিয়ে দিয়েছিল।...'তোমার বাসের সময় হয়ে এল। চা রেডি। মুখ ধোবার জলও রেডি। এবার উঠে পড়ো।'

বীরেশ্বর যেন আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে বেঁচে যায়। দুপুরে কিংবা বিকেলের বাসে গেলেও আমার ক্ষতি নেই। এমন কি বীরেশ্বরের বাড়ি দুচারটে দিন কাটিয়ে গেলে তো আরও ভাল হয়। কিন্তু সে আমার মুখের কথাটাই যেন আমল দিয়ে বসল।

ছেলেবেলার বন্ধুর বাড়ি এতকাল পরে গেছি। তার জোর করা উচিত ছিল। করল না।

করল না বলেই বীরেশ্বর সন্দেহভাজন হয়ে গেল আমার কাছে। ওর সম্পর্কে যা জেনেছি, তা সত্য না হয়ে যায় না। শুধু একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে, সে তো আমার কোন কথাই জানে না। তার জানা একেবারেই অসম্ভব। অথচ আমাকে অত তাড়াহুড়ো করে বিদায় দিতে ব্যস্ত হল কেন? ওর মুখ দেখে সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল, ওর মনটা অন্য কোথাও ব্যস্ত রয়েছে। খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে।

এই ভদ্রমহিলা বীরেশ্বরকে ভুলিয়ে দিলেন। এক সময় দূর শৈশব ও কৈশোরের কিছু সময় গ্রামেই ছিলুম। তারপর টানা বিশ বছরেরও বেশি কলকাতায় আছি। অন্যের কী হয় জানিনে, এখন গ্রামে গিয়ে পড়লে হাঁপিয়ে উঠি। সে সময় একজন শহরবাসী ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তখন কী যে স্বস্তি হয়, ভাবা যায় না!

বীরেশ্বরটা চিরকালই গোঁয়ার। তার ওপর একটানা গ্রাম-বাসের দরুন ও এমন আদিম হয়ে গেছে। এই সব ভেবে প্রসন্ন চিত্তে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু অচেনা মেয়েদের কাছে আগ বাড়িয়ে কথা বলা নিশ্চয় ভদ্রতাসম্মত নয়।

তাহলে ইনিই রায়বাবুদের সেজছেলের স্ত্রী! বীরেশ্বর এঁর কথাই বলছিল।...'প্রদীপকে মনে আছে তো তোমার, রায়বাহাদুরের নাতি—সেই যে ভাল ফুটবল খেলত! সে এখন দুর্গাপুরে থাকে। কী একখানা বউ জুটিয়েছে, দেখলে তাক লেগে যায়। ব্যাটা নিজে আসে না—বউকে পাঠায় শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে। আসল ব্যাপারটা হল, এখনও কিছু সম্পত্তি বাগান-পুকুর এসব আছে সেজবাবুর। ছেলে কেমন উড়নচণ্ডী, বাবা তো ভাল জানে। তাই ধুরন্ধর মায়াবিনী বউটাকে দিয়ে সামলানোর চেষ্টা করে।'

বলেছিলুম, 'ধুরন্ধর মায়াবিনী—বল কী!'

'দেখলে তো তাই মনে হয়। দারুণ মেয়ে!'—বীরেশ্বর বলেছিল। 'তবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে। শুনলুম, সকালের বাসে দুর্গাপুর চলে যাচ্ছে। শিরিষতলায় তেমন কাকেও দেখলে জানবে, ইনিই তিনি!'...বীরেশ্বর খুব হেসেছিল।

তাহলে ইনিই তিনি। কিন্তু তেমন ধুরন্ধর বলে তো মনে হচ্ছে না। একালে সচ্ছল পরিবারের বউরা যেমন দেখতে হন, তেমনি। তবে মায়াবিনী বলতে আপত্তি নেই। সুন্দরী যুবতী মাত্রই আমার মত আনাড়ি ব্যাচেলারের চোখে মায়াবিনী হতে বাধ্য, বিশেষ করে আকাশনীল ফিনফিনে নাইলন জর্জেটের তলায় যদি দেহের কিছু অংশ আভাষিত হয়।

স্থানকালপরিবেশ ভুলে যাবার পক্ষে এ ছিল যথেষ্টই। আমার চোখে দেড়শো মাইল দূরের শহর কলকাতার এক সুরম্য এলাকা ভাসছিল। এই নির্জন খাঁ খাঁ রাস্তা, গাছপালার ছায়া, ধূ ধূ শস্যশূন্য মাঠ আর গ্রাম মন থেকে মুছে গিয়েছিল। হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙল ভদ্রমহিলার কথায়।

'কিছু মনে করবেন না! প্লীজ, আপনার টাইমটা কত দেখুন তো?'

বিগলিত হয়ে ঘড়ি দেখে বললাম, 'জাস্ট সাতটা পঁয়ত্রিশ।'

'দেখছেন কী কাণ্ড! বাসটা এখনও এল না। সাতটা ত্রিশে পৌঁছনোর কথা এখানে।'

'সাতটা ত্রিশ! না, আটটা?'...আমি চমকে উঠলুম বীরেশ্বর কি ভুল সময় বলল তাহলে?

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন।...'আপনি কোনদিকে যাবেন, বলুন তো?'

'বহরমপুর। আপনি...' বলেই মনে পড়ে গেল, ইনি তো যাবেন দুর্গাপুর, প্রদীপের স্ত্রী ইনি। প্রদীপ—অস্পষ্ট চেহারাটা মনে আছে। কত বছর দেখিনি ওকে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি আপনার উল্টোদিকে। দুর্গাপুর। আপনার বাস নিশ্চয় লেট করবে না। আমারটা প্রায়ই এমন করে।' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি বুঝি প্রায় আসেন এখানে?'

'হ্যাঁ। আসতে হয়।'...জবাবটা কেমন অন্যমনস্ক শোনাল।

'কিছু মনে করবেন না। এখানে রায়বাবুদের বাড়ির প্রদীপ নামে একটি ছেলের সঙ্গে আমার ছেলেবেলায় পরিচয় ছিল। শুনলুম, সে দুর্গাপুরে থাকে এখন। আপনি কি...'

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন।...'হ্যাঁ, আমি—মানে প্রদীপ আমার স্বামী। আপনি ওকে চেনেন?'

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'খুব চিনি। বললুম না—ছেলেবেলায় আমার বন্ধুই ছিল বলতে পারেন। তবে প্রায় বিশ বছরেরও বেশি আর দুজনে দেখা হয়নি। কেমন আছে ও? ওকে আমার কথা বলবেন।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'এখন কলকাতায়। এক সময় আমাদের বাড়ি এ অঞ্চলেই ছিল। ওই যে দূরে যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে—শিমুলিয়া, ওখানেই। পড়তুম এই রাণীহাট হাইস্কুলে। তারপর বাবা কলকাতা চলে গেলেন। তারপর থেকে সেখানেই।'

প্রদীপের স্ত্রী খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল যেন। এবার ঘুরে দাঁড়াল। কালো চশমার ভিতর ওর চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল না। ভুরুর সামান্য কুঞ্চন দেখলুম।...'কী করতেন আপনার বাবা?'

'ডাক্তারি।'

'তাই বুঝি। আপনি কী করেন?'

'একটা কোম্পানিতে ছোটখাটো চাকরি করি।'

'কেন?'...আবার একটু হাসল প্রদীপের স্ত্রী।...'আপনি ডাক্তার হতে পারলেন না?'

'পারলুম কই?' বলে আমি জোরে হেসে সিগ্রেট ধরালুম।

'এখানে কোথায় এসেছিলেন?'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'মানে—হঠাৎ একবার জন্মভূমি দেখার ইচ্ছে হল, তাছাড়া আর কী বলব? রাণীহাটে আমার বন্ধুবান্ধব সহপাঠীও আছে দুচারজন। দেখা করে গেলুম। আবার কখনো আসব কি না, ঠিক তো নেই। আপনি কিন্তু আপনার মিস্টারকে বলবেন আমার কথা।'

প্রদীপের স্ত্রী দূরের দিকে বাসের খোঁজে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি কিন্তু আপনার নামটা এখনও বলেন নি। আপনার বন্ধুকে কীভাবে বলব?'

'আমার নাম আনোয়ার চৌধুরী।'

'আচ্ছা!' বলে যেন একটু অবাক হয়ে দু মিনিট চুপচাপ আমাকে দেখতে লাগল প্রদীপের স্ত্রী।

ভাবলুম, সম্ভবত আমার মুসলমান নামটার জন্যে ও একটু চমক খেয়েছে। এমন হতে আমি বরাবর দেখেছি। আসল হয়েছে কী, শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মুসলমান এত কম দেখতে পান হিন্দুরা, বিশেষ করে হিন্দু মেয়েরা তো তাও পান না,—আমি দেখেছি, আমার পরিচয় দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু চমকের সৃষ্টি করে ফেলি।

'আপনি কি অবাক হলেন?' না বলে থাকতে পারলুম না।

প্রদীপের স্ত্রী একটু অপ্রস্তুত হল যেন।...'না, না। তা কেন?'

হাসতে হাসতে বললুম, 'এক ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন—আপনাকে মুসলমান বলে চেনাই যায় না।'

'চেহারা দেখে কারও কিছু জানা যায় না।'...হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে উঠল ওর মুখভঙ্গী।...'ওটা নিজেদের দুর্বলতা।'

হয়তো আমার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছে প্রদীপের সুশিক্ষিত মডার্ন বউ—এই ভেবে ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কিছু মনে করবেন না।

আপনি আমার ছেলেবেলার বন্ধুর স্ত্রী। ও একটু রসিকতা করলুম মাত্র।'

দূরের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'এবার বাসটা আসছে। ইস্, এত লেট করে!'

'প্লীজ, প্রদীপের ঠিকানাটা দেবেন?'

'লিখে নিন।'

পকেট থেকে কাগজ বের করে আঁকাবাঁকা হরফে ঠিকানাটা লিখে নিলুম।

'আপনার কলকাতার ঠিকানাটাও লিখে দিন না। ও খুশি হবে।'

লিখে দিলুম। চিরকুটটা ভ্যানিটিব্যাগে ভরে নিয়ে প্রদীপের বউ রাস্তায় উঠে গেল। বাসটা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। সাতটা পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেছে। এখনও পনেরো মিনিট কিংবা তারও বেশি আমাকে একা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মহিলাটির সঙ্গে বেশ সময় কেটে যাচ্ছিল। প্রদীপ চমৎকার বউ পেয়েছে সন্দেহ নেই। কেমন যেন স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের মত ভাবভঙ্গী কথাবার্তা—ব্যক্তিত্বটাও দারুণ। তাহলেও কী যেন আছে, কী যেন টানে—খুব ভিতর দিক থেকে টানে।

বাসটা এসে দাঁড়িয়ে গেল। ওঠবার আগে আমার দিকে ঘুরে একটু হাসল প্রদীপের বউ।...'ক'দিন আছেন এখানে? শিমুলিয়া, না বহরমপুরে থাকছেন?'

'কিছু ঠিক নেই।'

'আচ্ছা, চলি। নমস্কার।'

'নমস্কার। প্রদীপকে বলবেন।'

'নিশ্চয় বলব। ঠিকানা নিলুম কেন?'

'কলকাতা গেলে অবশ্যই...'

বাসের ছোকরা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বাসের গায়ে থাপ্পড় মেরে বিকট চেঁচিয়ে উঠল—'ঠিক আছে, ঠিক আছে!'

বাসটা চলতে লাগল। জানালায় প্রদীপের বউয়ের মুখ দেখা গেল। ঠোঁটে হাসি। মায়াবিনী! বীরেশ্বর ঠিকই বলেছিল।...

বাসটা চলে গেলেও সেই সুগন্ধটা থেকে গেল। প্রদীপের বউয়ের কথাগুলোও আমার মাথা থেকে গেল না। শিরিষ গাছের ছায়ায় সকালবেলার হাল্কা বাতাস বইছে। সামনে বিশাল রুক্ষ মাঠে রেশমি রোদ্দুর সোনালী চিকণ আভা ছড়াচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কোন লোক নেই। এই নির্জনতা আর নৈঃশব্দ্য আমাকে বোবা ও কালা করে ফেলছিল। অন্য কারো কী হয় জানিনে, পাড়াগাঁয়ে গেলেই আমার এটা হয়—যেন একটা সাউণ্ডপ্রুফ বদ্ধ ঘরে ঢুকে গেছি। হয়তো সারাক্ষণ নানারকম শব্দ আর কোলাহল শুনতে অভ্যস্ত কানের পক্ষে ওই রকম স্তব্ধতা খুব গভীর একটা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করে।

অথচ প্রকৃতপক্ষে সেখানটা মোটেও স্তব্ধ ছিল না বা থাকে না। বাতাসের শব্দ, পাখি আর পোকামাকড়ের, জীবজন্তুর ডাক, কখনও মানুষের কণ্ঠস্বর থাকে। এগুলো অবশ্য প্রকৃতিরই নিজস্ব ভাষার মত।

আসলে হয় কী, খোলামেলা বিশাল আকাশ ও বিস্তৃত জায়গার পক্ষে ওইসব শব্দ এত কম বলেই আমার মত বহিরাগতের কাছে তা দারুণ স্তব্ধতা ছাড়া কিছু নয়।

প্রদীপের বউ চলে গেলে এই স্তব্ধতাটা আমাকে কামড়ে ধরল চারদিক থেকে। খুব অকারণে নিজের জীবনটা ব্যর্থ লাগল। প্রদীপ—রায়বাবুদের সেই গোলগাল ভোম্বলমার্কা নাকমোটা ছেলেটি কুড়ি বছর যেতে না যেতে এমন একটা আশ্চর্য বউ জুটিয়ে ফেলেছে। আমি দেখেছি, কোন কোন মেয়ে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ভীষণ চেনা হয়ে ওঠে এবং মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। খুব আপন মনে হয়

এদের। ওর প্রত্যেকটি কথা আমার কানে বাজতে লাগল। চেহারার হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব নিয়ে খোঁচা-মারা কথাটা বলা আমার উচিত ছিল না। তবে ও চমকে উঠেছিল নাম শুনে, এটা ঠিকই। 'চেহারা দেখে কারো কিছু জানা যায় না'···সে তো ঠিকই। আমার চেহারায় যেমন মুসলমানত্ব বলে কিছু নেই, তেমনি আমার চাকরির পরিচয়ও তো ছাপা নেই। সেটা, অর্থাৎ যাকে বলে 'আইডেনটিটি কার্ড', আমার ভিতর পকেটে সাবধানে রাখা আছে। আমার এই ভদ্র ভব্য মুখের ওপরতলায় ঘিলু নামক ধুসর রংয়ের জিনিসে কী মারাত্মক ষড়যন্ত্র সীল করে রাখা হয়েছে, এবং এই মুখোশটা দেওয়া হয়েছে—বাইরে তার কোন চিহ্ন পাবারও উপায় নেই।

আমার এই মুখোশে বড় বড় হরফে লেখা আছে: দিস ইজ টু সারটিফাই দ্যাট শ্রীআনোয়ারুল চৌধুরী বিশ বছর পরে তার জন্মভূমি দেখতে যাচ্ছে। সে এই এলাকায় তার একসময়ের চেনা লোক এবং বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবে। তাদের কারো-কারো বাড়ি সুযোগ পেলে রাত্রিবাসও করবে। সে ক'দিন থাকবে কোন ঠিক নেই। একটা লম্বা ছুটি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেবেলার স্মৃতি তাকে কতদিন ধরে উত্যক্ত করছিল। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত এই চৌত্রিশ বছর বয়সের অবিবাহিত যুবকটির কাছে তার জন্মভূমির মাটি আকাশনিসর্গ এখন পবিত্র তীর্থের সান্ত্বনা। নগর-জীবনের জটিলতা ও জ্বালা, এবং সাম্প্রতিক অবক্ষয়, অন্ধকার ও পচনশীলতা থেকে পালিয়ে সে কয়েকটি দিন এখানে সুখ-স্বস্তি চায়।···

বীরেশ্বর এগুলো সম্পর্কে বলছিল, 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস···তাই। তুমি এখনও সেইরকম আছ আনোয়ার, একটুও বদলাও নি।'

'কীরকম শুনি?'

'সেই উদাস-উদাস কবিটাইপ।···হুঁ', কথাটা হল—জ্বালা

এখানে প্রচণ্ড। দেখ, এসেছ যখন, কিছু সুখ-শান্তি এখানে পাও নাকি। তবে আমার অবাক লাগছে।'

'কেন?'

'এটা বেড়ানোর সময় নয়। প্রচণ্ড খরা। আগুনের হল্কা বইছে সারাদিন। আর এ এলাকার খরার আবহাওয়া তো তোমার জানা।'

'বললুম তো। ছুটিটা হঠাৎ পেয়ে গেলুম—তাই।'

বীরেশ্বর খুক-খুক করে একটু হেসেছিল। সওয়া ছফুট উঁচু প্রকাণ্ড মানুষ বীরেশ্বর। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই লোহার রড দুমড়ে দিত এক দমকে। এখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। এখন আর ওসব নেশা নেই। বাইশ বছর বয়সে একজনকে প্রচণ্ড মার দিয়েছিল কী কারণে। মামলা চলতে চলতে লোকটা হঠাৎ মারা যায়। বীরেশ্বরের তিনবছর সশ্রম জেল হয়। হঠাৎ সে জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়ে আসে। দুমাস পরে ধরা পড়ে। তখন আরও সাত বছর তাকে জেলে কাটাতে হয়। ফিরে এসে সে কিছুদিন পল্লীসমিতি ইত্যাদি করেছিল। গ্রামের উন্নতিমূলক কাজ-কর্মে মন দিয়েছিল। হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে সব ছেড়ে রাজনীতিতে ঢুকল। তারপর সে আবার দুর্দান্ত মানুষ হয়ে উঠল। তার এবারের পরিচয় সম্পূর্ণ অন্যরকম।

মাত্র একটা বিকেল আর একটা রাত বীরেশ্বরকে বুঝে ওঠার পক্ষে কিছুই নয়। ওর সম্পর্কে যে পাতার পর পাতা খুঁটিনাটি তথ্য—যাকে বলে ডেট বাই ডেট, আমাকে দেখানো হয়েছে—সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা আমি করি নি। এখনও সময় আর সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি। আবার আমাকে যেতে হবে বীরেশ্বরের কাছে।...

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। বীরেশ্বরের দিকে সরে গিয়েছিল মন—অনিবার্যভাবে। আবার খেই ধরে ফিরে এলুম।...

'চেহারা দেখে কারো কিছু জানা যায় না।'...হঠাৎ আমার মাথায় খুব ভিতর দিকে একটা ঠাণ্ডা সাপ চলে গেল যেন। চমকে উঠলুম।

মাই গুডনেস! আজ বিশবছর পরে যার জন্যে এখানে ফিরে এসেছি, চেহারা দেখে কি তাকে চিনতে পারব? 'চেহারা দেখে তো কারো কিছু জানা যায় না!' প্রদীপের বউ কথাটা ঠিকই বলে গেল। কিন্তু 'জানা যায় না' বলল কেন? 'চেনা যায় না' বললেই স্বাভাবিক হত না কি?

দুর্গম স্মৃতির ভিতর একটা আবছা মুখ ভেসে উঠল। বছর ন'দশ বয়সের একটি মুসলিম চাষীপরিবারের মেয়ে। একটু ফরসা রং হয়তো। নাকের সিকনি মুছতে জানে না। খালি গা, কোমরে একফালি ন্যাকড়া পেঁচানো। ওই বয়সেই স্তনের বোঁটাটা বেশ-প্রসারিত ও লালচে হয়ে উঠেছে। মাথা-ভর্তি রুক্ষ ঝাকড়-মাকড় লালচে চুল। সকালে তাকে দেখছি আমার মায়ের দেওয়া পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া ব্লাউজটা গায়ে জড়িয়ে মসজিদে মৌলবীর কাছে পড়তে যাচ্ছে। দুপুরে দেখেছি শিমুলতলার বাঁজাডাঙায় ছাগল চরাচ্ছে খালি গায়ে। ওর বাবা ছিল ভীষণ গরীব। আমাদেরই কিছু জমি একসময় ভাগচাষে করত-টরত। পরে ছেড়ে দিয়েছিল। বাবা বলতেন, ইরফানের যক্ষ্মা হয়েছে। বাবার চিকিৎসায় কোন ফল হয়নি। আমরা থাকতে থাকতেই মারা গিয়েছিল লোকটা। তখন বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে বা টুকিটাকি কাজকর্ম করে ওর মা পেট চালায়। মেয়ে মাঠে ছাগল চরায়। আমার একটা অদ্ভুত মমতা ছিল মেয়েটির সম্পর্কে।

আমাদের কলকাতা চলে আসার আগের বছর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমার মামাবাড়ি আত্রাইনগর শিমুলিয়া থেকে দশমাইল দূরে। সেখানে পৌষে দাদাপীরের মেলা বসে। মেলায় সেই প্রথম সিনেমা দেখলাম। ছবিটার নাম ছিল 'লায়লা-মজনু'।

তেরো বছর বয়সের একটি ছেলের মনে আশ্চর্য একটা বোধের জন্ম হল।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, দশমাইল পথ কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়িটা আসছে। উদাসীন অন্যমনস্ক আমি পিছনে হেঁটে আসছি। আমার মন জুড়ে লায়লা, আমার চোখে পাড়াগাঁয়ের আকাশ আর মাঠ আরবের শহর হয়ে উঠেছে। সেই কচিকাঁচা বয়সে ওই দশমাইল রাস্তা হেঁটে আসতে আসতে আমি ইরফান শেখের মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছিলুম।

কারণ, ওর নামও ছিল তাই। লায়লাটা অবশ্য একটু তাচ্ছিল্যমেলা আদরে লায়লি বা লাইলি হয়ে উঠেছিল—এই যা। যদ্দুর মনে পড়ে, ওর এ নামটা দিয়েছিলেন সেই মৌলবীসায়েব। খুঁড়িয়ে চলতেন বলে সবাই তাঁকে বলত খোঁড়া মৌলবী। রাণীহাট হাইস্কুলে উনি আরবি শিক্ষক ছিলেন। থাকতেন শিমুলিয়ার মসজিদে। সকাল-সন্ধ্যা চাষী ছেলে-মেয়েদের আরবি আর বাংলা বর্ণবোধ পড়াতেন। পালা করে সবাই ওঁর খাওয়া যোগাত। ঘোড়ায় চেপে খোঁড়া মৌলবী স্কুল যাওয়া-আসা করতেন। ওঁর ঘোড়াটা আমাদের হাতে পড়ে কী দুর্গতিই না সইত।

লাইলিকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম 'লায়লা-মজনু' সিনেমাটা দেখার পর থেকে। ওই গরীব ছাগলচরানী মেয়েটি আমার চোখে ছিল আরবের ধনী সওদাগরকন্যা। তারপর কত ছলে ওর সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করেছি। পীরের মাজারে কত নির্জন দুপুর···কাঠমল্লিকার গন্ধে ভরা গ্রীষ্মকাল,···দু-চারটে অকারণ উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা।···অবশ্য পরে একদিন সবটাই হাস্যকর লাগত। কলকাতায় গিয়ে যখনই লাইলির কথা ভেবেছি, নিজের দীনতার প্রতি লজ্জা জেগেছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা কী বোকা! কত সুন্দর আশ্চর্য সব মেয়ে এখানে—শিমুলিয়ার লাইলি যেন আমার ভালবাসা ও সৌন্দর্যবোধের পক্ষে দারুণ দীনতার প্রতীক।

তাকে মনে পড়লে লজ্জা পেতুম বলেই তার স্মৃতিটা জোর করে মনের তলায় গভীর অন্ধকারে অনাদরে ছুঁড়ে ফেলেছিলুম।

আজ বিশবছর পরে সেই লাইলির জন্যেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে—এই একটা অদ্ভুত যোগাযোগ।

রাণীহাটে বীরেশ্বরের কাছে এসেছিলুম ওই একই উদ্দেশ্যে। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে আপাতত। কিন্তু একটা গভীর ছটফটানি চলছে ভিতরে সারাক্ষণ। বিশবছর পরে লাইলির চেহারা এখন কেমন হয়েছে? তাকে দেখলে চিনতে পারব তো? প্রদীপের বউ বলে গেল, 'চেহারা দেখে কারো কিছু জানা যায় না।' উঁহু—হয়তো সেটা ঠিক নয়। বীরেশ্বরের চেহারায় তো ওর দুর্দান্ত স্বভাবের ছাপ স্পষ্ট দেখে এলুম। লাইলির চেহারায় কিছু ছাপ না থেকে পারে না।

ঘড়ি দেখলুম, কখন আটটা বেজে গেছে। এ বাসটাও লেট করছে। অন্যভাবেও যাওয়া যেত। রাণীহাটে একটা জিপ গেছে —গত রাতে যাবার কথা। ধুলোয় চাকার দাগও দেখে এলুম। জিপটা ইরিগেশানের। কী একটা এনকোয়ারিতে আসবে—এই মত কথা আছে। যদি সব ঠিক ঠিক ঘটে যেত, আমার ওই জিপে বহরমপুর যেতে বাধা ছিল না। কিন্তু সব ব্যর্থ। অতএব আমাকে বাসেই ফিরতে হবে।

অবশ্য এখন কোথাও কোন লোক নেই। জিপটা এসে পড়লে টুপ করে উঠে পিছনে বসে পড়তুম। কেউ দেখত না। কিংবা দেখলেও ভাবত, ভদ্রলোক একটা লিফ্‌ট ম্যানেজ করলেন। জানিনে, তাতে কোন ধুরন্ধর লোকের সন্দেহ হত কি না।

কিন্তু এবার ক্রমশ অসহ্য লাগছে। রাতে ঘুম হয়নি উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায়। চোখ জ্বালা করছে। গগলসে ঘাম জমে যাচ্ছে।

একটা চাপা গুর গুর শব্দ শুনলুম পিছনে। ঘুরে দেখি, রাণীহাট থেকে জিপটা ধুলো উড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে।

ওই লঝ্ঝড় রাস্তায় অত জোরে আসছে কেন? একটু অবাক হলুম।

বড়রাস্তায় এসে আমার সামনেই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল জিপটা। গাদাগাদি ছ'জন বসে আছে। সামনের সিটে দুজন। মুখার্জি প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এই যে স্যার কতক্ষণ?'… সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল ব্যস্তভাবে।

একটু হেসে বললুম, 'আধঘণ্টা প্রায়। নো চান্স!'

'কোন বাস যায় নি?'

'একটা গেল—মিনিট পনেরো আগে। আপে।'

'কেউ চাপল দেখলেন?'

'হ্যাঁ—এক ভদ্রমহিলা।'

মুখার্জি একলাফে নেমে দাঁড়াল। 'নীল শাড়ি, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, চোখে গগলস?'

'হ্যাঁ। কেন? আমার সঙ্গে পরিচয় হল ভদ্রমহিলার। এখানে রায়বাবুরা আছেন, তাঁদের বাড়ির বউ। প্রদীপ নামে আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল—এখন দুর্গাপুরে থাকে। তারই স্ত্রী। ঠিকানা দিয়ে গেলেন।'

জিপ থেকে দত্ত বলল, 'মুখার্জি, চলে এস। ধরে ফেলব—ওনলি ফিফটিন মিনিটস। বাবুগঞ্জের আগেই ধরে ফেলব। আপনি আসবেন, স্যার?'

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। বললুম, 'কী ব্যাপার?'

মুখার্জি একলাফে গাড়িতে উঠে বলল, 'চলে আসুন, স্যার। আপনার প্রদীপবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আবার দেখা হবে।'…সে হো হো করে হেসে উঠল।

পা বাড়িয়ে বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী হয়েছে কী, বলবেন তো মিঃ মুখার্জি?

মুখার্জি একটু ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ওই দেখুন—প্রদীপবাবুর

রিয়েল স্ত্রী ওই পুকুরের পাড়ে—জেলে দিয়ে মাছ ধরাচ্ছেন। বেচে টাকাকড়ি নিয়ে দুর্গাপুরে চলে যাবেন ইন টাইম।'

একটু সরে জায়গা দিল সে। আমি এক মোটাসোটা ভদ্রমহিলাকে অদূরে পুকুরপাড়ে জেলেদের তম্বি করতে দেখলুম। পলকে আমার মাথার ভিতরটা শূন্য হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। 'তাহলে যাকে দেখলুম সে কে?'...বলে মুখার্জির পাশে কলের পুতুলের মত উঠে বসলুম।

মুখার্জি একটু হেসে জবাব দিল, 'লাইলি খাতুন।'

লাইলি খাতুন। এখনও আমার নাকের ভিতর সেই খর সুগন্ধ মোছেনি।

বীরেশ্বর আমাকে ঠকাল। ওর চতুরতার সত্যি কোন সীমা নেই। গোপনীয় নথির পাতায় যা আমি পড়ে এসেছি, তা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। এখন দেখছি, আমি ভুল করেছি।

আর লাইলি খাতুন সম্পর্কে যা রেকর্ড তা তো আমি একটুও বিশ্বাস করিনি। সম্ভবত এ রিপোর্ট পাওয়া গেছে এমন লোকের কাছে, যে কিংবা যারা মেয়েটির প্রতি কোন কারণে ক্ষুব্ধ এবং বিদ্বেষপরায়ণ। লালবাজার হেডকোয়ার্টার্সের সেই নির্জন ঘরে বসে নথিগুলো পড়তে পড়তে আমার চোখে ভেসেছিল একটি সুন্দরী পাড়াগেঁয়ে যুবতী। মাথার ওপর হয়তো কেউ নেই। হয়তো নানা কারণে একটু চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। তার ফলেও নানা ব্যাপারে একটু আধটু জড়িয়ে থাকবে। তাছাড়া যদ্দুর মনে আছে, মেয়েটি একটু জেদী টাইপের ছিল। আমার অভিজ্ঞতায় জানি, এ ধরনের মেয়েরা স্বভাবত স্বৈরিনী হয় এবং অনেক পুরুষকে সঙ্গ দেয়, পাত্তা দেয় না। তাই তাদের ওপর অনেকের ভীষণ রাগ

থাকে। লাইলি সংক্রান্ত রেকর্ড সেই রাগেরই প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছু ভাবতে পারিনি।

ফাইল বুজিয়ে রেখে আমি হেসেছি আর সিগ্রেটের ধুঁয়োর মধ্যে লাইলিকে দেখবার চেষ্টা করেছি। বার বার সেই ছাগলচরানী বালিকাকেই দেখতে পেয়েছি। ফাইলের ওপর ক্যাপিটাল হরফে লেখা আছে: লাইলি খাতুন। বাবার নাম: মৃত ইরফান শেখ। পেশা: চাষবাস। গ্রাম: শিমুলিয়া, পো: রাণীহাট, থানা: বাবুগঞ্জ, ইত্যাদি। তারপর খুঁটিনাটি তারিখ ও সময় দিয়ে লেখা বিচিত্র কিছু ঘটনা। এইসব গোপনীয় ফাইল জেলার সদর থেকে পাঠানো হয়েছিল। পিনে আঠকানো একটুকরো কাগজে নোট ছিল: এ স্পেসাল কেস ফর ভেরি আর্জেণ্ট এ্যাণ্ড ইমিডিয়েট এ্যাকশান অ্যাণ্ড স্ট্রংলি রেকমেনডেড বাই অনারেবল মিনিস্টার··· অতটুকু কাগজটায় আরো অজস্র ক্ষুদে নোট ছিল। শেষ তারিখটা দিয়ে সই করেছেন এ. সি. ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। সংক্ষিপ্ত নির্দেশ তাঁর: শ্রী এ চৌধুরী, স্পীক অ্যাটওয়ান্স।

এ. সি. অরিন্দম ত্রিবেদী ওই জেলারই লোক। ফাইল দুটো পড়া শেষ করে তাঁর ঘরে যেতেই হেসে বলেছিলেন, 'পড়া হয়েছে? বসুন।'

আমার মাথার ভিতর থেকে ঘোরলাগা ভাবটা তখনও যায় নি। বসে বললুম, 'হ্যাঁ, পড়লুম। কিন্তু আমার ধারণা, কোথাও কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে।'

মিটিমিটি চেয়ে হাসছিলেন মিঃ ত্রিবেদী।···'যেমন?'

'যেমন এই লাইলি খাতুনের ফাইলটা। আমি তো ভীষণ চিনতুম ওকে। একই পাড়ায় বাড়ি ছিল।'···লাইলি সম্পর্কে আমার যা কিছু বাল্যস্মৃতি অকপটে বলেছিলুম।

মিঃ ত্রিবেদী একটা সিগ্রেট দিয়ে বলেছিলেন, 'সেই জন্যেই দি কেস ইজ নাউ ভেরি প্রপারলি অ্যাট ইওর ডিসপোজাল চৌধুরী।

আপনার বাড়ি শিমুলিয়ায় ছিল, তা জানতুম। তবে যা বললেন লাইলি খাতুন সম্পর্কে, আমি জানতুমও না—ভাবিও নি। নাউ, আই কনসিডার ইট এ গ্র্যাণ্ড লাক। এ একটা আশাতীত যোগাযোগই বলব। উইশ ইউ এ গ্র্যাণ্ড সাকসেস। ওখানে লোকাল থানা তো বটেই, জেলার সব থানা আর ইনটেলিজেন্সের লোকজন আপনাকে সবসময় সাহায্য করবে। তাছাড়া রাণীহাট এলাকায় আমাদের ইনফরমার আছে কিছু—' বলে একটু ভেবে নিয়েছিলেন।…'নো। সেটা আপনার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ইনফরমারদের আপনার পরিচয় জানানো ঠিক নয়। আফটার অল, দে আর লোকাল পিপল অ্যাণ্ড মে বি ইণ্টারেস্টেড আদারওয়াইজ। ঠিক আছে। আপনি যান।'

সব আয়োজন সম্পূর্ণ হলে মিঃ ত্রিবেদী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'কিন্তু দেখবেন মশাই, আপনাকে আবার নস্টালজিয়ায় পেয়ে না বসে। আপনার বাল্যপ্রিয়া লাইলি খাতুনও এদিকে নাকি দেখতে টেখতে এমন, মুণ্ডু ঘুরিয়ে না ছায়। বি ভেরি—ভেরি কেয়ারফুল ইয়ংম্যান।'

'স্যার, ওর কোন ফটো নেই?'

'না। অদৃশ্য মায়াবিনীর কোন ছবি নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

'বীরেশ্বর ব্যানার্জিকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না কেন?'

'কী দেখলেন ফাইলে? আপনি ভারি অন্যমনস্ক, চৌধুরী।'

এ. সি. ঠিকই বলেছিলেন। নথিগুলো আমি আদৌ মন দিয়ে পড়িনি। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। হিজিবিজি কার্বন কপির ওপর নিরন্তর ভেসে থাকছিল আমার ছেলেবেলাটা—দুর্লভ হারানো সেই অতীতকাল, যখন একে একে জীবনের চোখ ফোটে, একটি করে কামনা-বাসনা সুগন্ধ ছড়ায় নিজের চারপাশে।…'পড়েছি স্যার। কিন্তু তেমন কিছু…'

'উঁহু। ইউ রিড ইট এগেন এ্যাণ্ড এগেন। মাই অর্ডার, চৌধুরী।'

'আবার পড়ছি স্যার।'

'বীরেশ্বর ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কোন কংক্রিট চার্জ আনা যাচ্ছে না। অথচ আমরা জানি সে কী করছে না-করছে।'

'লাইলি খাতুনের বিরুদ্ধে কংক্রিট চার্জগুলো কী?'

হো হো করে হেসে ফেলেছিলেন মিঃ ত্রিবেদী।...'আপনি মশাই এ লাইনে এসে জুটেছিলেন কেন, আমি ভেবেই পাইনে। ছদ্মনামে পদ্য-টদ্য লেখেন না তো?'

সেই সময় গোয়েন্দা বিভাগের এক ইন্সপেক্টার বারীন রুদ্র—সবার প্রিয় বারীনদা, ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'কী হল স্যার? আনোয়ার কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে কেন?...

মিঃ ত্রিবেদীর কাছে সব শুনে বারীনদা বলেছিলেন, 'সে যাই হোক, আনোয়ার ইজ দা রাইট ম্যান, স্যার। দেখতে মুখচোরা মিনমিনেটি হলে কী হবে। গত অগাস্টে মিসেস রমলা ওরফে সুলতানা বেগমের কেসটা কী দুর্দান্তভাবে ট্যাকল্ করল। উঃ, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, স্যার! একটা মারাত্মক স্পাই-রিং কীভাবে গুঁড়ো হয়ে গেল। যাই বলুন, আনোয়ার বাঘা-বাঘা সুন্দরীর সঙ্গে প্রেম জমাতে ওস্তাদ, এ আপনাকে স্বীকার করতেই হবে স্যার। ভাবা যায়? অমন দুঁদে মেয়ে ওর প্রেমে এমন হাবুডুবু খেতে লাগল যে...গুড গড! আমাকে এক্ষুনি শ্যামবাজার যেতে হবে যে! সর্বনাশ!'...স্যালুট ঠুকে বারীনদা চলে গিয়েছিলেন।

মিঃ ত্রিবেদী বলেছিলেন, 'তাহলে চৌধুরী, ইজ স্থাট ক্লিয়ার?'

'ইয়েস স্যার।'

'মনে রাখবেন শুধু, লাইলি খাতুন আর সেই স্পাই মহিলা সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের। লাইলি খাতুন আফটার অল গ্রামের মেয়ে—বিশেষ করে ব্যাকওয়ার্ড মুসলিম চাষী পরিবারের মেয়ে—তেমন কিছু লেখাপড়া মোটেও জানে না। কাজেই তাকে ভদ্রমহিলা ভেবে বসবেন না। পোশাক-টোষাকে তাকে ভদ্রমহিলা

বলে ভুল হতে পারে অবশ্য। তবে আপনার চোখে ধরা পড়ে যাবে। বিশেষ পল্লার মেয়েরাও তো ভদ্রমহিলা সেজে ভিড়ে ঘোরে। তাদের সহজেই চেনা যায়। এই লাইলি খাতুনকেও চেনা যাবে। তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আপনি যেন নার্ভাস হয়ে পড়ছেন চৌধুরী?'

'না স্যার। হঠাৎ মাথাটা ধরেছে যেন।'

'ট্যাবলেট খেয়ে ফেলুন। আজ রাতের গাড়িতে যাচ্ছেন তো?'

'তাই যাব।'

'অলরাইট। উইশ ইউ গুড লাক।'

করমর্দন করে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ এ. সি. বলেছিলেন, 'একটা কথা চৌধুরী। লাইলি খাতুনের কাছে কখনো নিরস্ত্র হয়ে যাবেন না। নেভার। আর, দেখুন—নথিগুলো দেখতে দেখতে আমার কেমন যেন মনে হয়েছে, ছাট বীরেশ্বর ব্যানার্জির সঙ্গে মেয়েটির কোন ইমোশনাল সম্পর্ক আছে।'

চমকে উঠেছিলুম। একটা অশিক্ষিতা খুনে মেয়ের সঙ্গে বীরেশ্বরের প্রেম! তাছাড়া একজন মুসলমান, অন্যজন হিন্দু···

বাইরে বেরিয়ে মনে হয়েছিল, কী ভাবছি! অপরাধীদের যেমন জাতবিচার ধর্মবিচার নেই, তেমনি প্রেমেরও তো তাই।

অনেক পরে যখন ট্রেনে চেপে বসেছি, তখন টের পেয়ে গেলুম —আমি ঈর্ষান্বিত। ভিতরে একটা ছটফটানি চলেছে। রাগে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। রাগটা বীরেশ্বরের প্রতি—নাকি লাইলি খাতুনের প্রতি, ঠিক করতে পারছিলুম না।

সেই সময় মনে পড়েছিল, আগের দিন ডিপার্টমেন্টাল কনফারেন্সে একজন সকৌতুকে বলেছিলেন, 'চৌধুরী আবার জড়িয়ে না যায় উল্টোপাকে। ওর পক্ষে ইমোশনাল ইনভলভমেণ্ট খুবই স্বাভাবিক। একে বাল্যসঙ্গিনী, তার ওপর অমন প্রেমানুষঙ্গিক নাম—লাইলি!···

জিপে যেতে যেতে বার বার গা শিউরে উঠছে আমার। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। তাহলে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে আমার আকস্মিক আর অবিশ্বাস্যভাবে কেটে গেছে লাইলির সঙ্গে। সেই লাইলি! তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলেছি, তাকে দেখেছি খুঁটিয়ে—অথচ একটুও চিনতে পারি নি। এতক্ষণে আমার পরিচয় শুনে তার চমকে ওঠার মানে স্পষ্ট হল। সে আমাকে প্রথমে চিনতে পারে নি—

উঁহু, বীরেশ্বর নিশ্চয় তাকে আমার কথা বলেছে। ওটা লাইলির চালাকি। কিন্তু বীরেশ্বর বা সে দুজনের কেউই তো আমার অন্য পরিচয় জানে না।* তাহলে লাইলি নিজের পরিচয় দিল না কেন? আনোয়ার চৌধুরী কুড়ি বছর আগে এখানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। থাকে কলকাতায়। তাকে নিজের পরিচয় দিল না কেন লাইলি? সম্ভবত বীরেশ্বরের নিষেধ ছিল। ওরা আসলে ভীষণ সাবধানী আর চতুর। কাকেও বিশ্বাস করে না। আমাকেও বিশ্বাস করে নি। কিন্তু আমি কি বোকার মত বীরেশ্বরের কথায় 'প্রদীপের স্ত্রী' ঘটিত ধাপ্পায় পড়ে গেলুম।

এখন আর পস্তে লাভ নেই। সামনে একটা চান্স রয়েছে। সুনিশ্চিত চান্স। বাসটা ধরে ফেলতে আর দেরি নেই। জিপের গতি হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ভাগ্য ভাল। রাস্তা ফাঁকা মোটামুটি। জিপের সবাইকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'আমি বরং পিছনে যাই মিঃ মুখার্জী।'…একটু ভেবে নিয়ে বললুম। 'যদি কোন এদিক-ওদিক ঘটে যায়, আমাকে আপনাদের সঙ্গে দেখে ফেলা ঠিক হবে না। বুঝতে পারছেন?'

মুখার্জী একটু হেসে জবাব দিল, 'সে ঠিক। তবে ওই বাসে উঠতে যদি দেখে থাকেন, আর এড়িয়ে যাবার কোন চান্স নেই। আপনি ঠিক দেখেছেন তো স্যার?'

'নিশ্চয় দেখেছি। কথা বলেছি।'

‘তাহলে ঠিক আছে। অর্জুন, তুমি সামনে এসো—আমি কাত হচ্ছি। স্যার পিছনে যাবেন।’

অনেক কষ্টে পিছনে ঘুপটিতে লুকিয়ে বসলুম। আশ্বস্ত হওয়া গেল। বললুম, ‘আপনারা খবর পেলেন কখন যে ও বাসরাস্তায় এসেছে?’

মুখার্জী বলল, ‘সেইটেই তো দেরি হয়ে গেছে। সম্ভবত আপনি গিয়ে পড়ায় বীরেশ্বর ওকে কোথাও সরিয়ে ফেলেছিল। এদিকে আমরা তো আপনার সিগন্যালের জন্যে রাত জাগছি। আপনি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। তখন দত্ত আর আমি আপনার জানলার নিচেই আছি। বুঝলুম, আর হল না। হয় খবর ভুল ছিল, নয়তো যা বলছিলুম—সরিয়ে রেখেছে কোথাও। ফিরে গিয়ে শিবু মণ্ডলের বাড়ি শুয়ে পড়লুম। শিবু সত্যি সত্যি ইরিগেশনের লোক ভেবে সেই রাতে যা খাওয়া দিল, দারুণ স্যার! আমরা আপনার কথা ভাবছিলুম।’

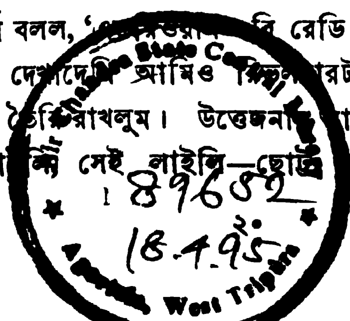
‘আমার বাল্যবন্ধুও মন্দ খাওয়ায়নি মুখার্জী।’

‘ভাল স্যার, ভাল। তারপর শুনুন, সকাল থেকে শিবুর আবেদন শুনে যাচ্ছি, আর দত্ত নোট নিচ্ছে। আমরা ভিতর-ভিতর ভীষণ ব্যস্ত। ইনফরমার রাণীহাট চষে বেড়াচ্ছে, ফিরছে না। ফিরল যখন, তখন সাড়ে সাতটা আর নেই—জাস্ট সাতটা তেতাল্লিশ প্রায়। তক্ষুনি গাড়ি ছুটিয়ে চলে এলুম। তো…’ হাসতে লাগল মুখার্জী।

ড্রাইভার বলল, ‘সামনে বাস মনে হচ্ছে। বাঁক পেরোলেই বোধহয় দেখতে পাব স্যার।’

মুখার্জী বলল, ‘এভরিওয়ান বি রেডি। কুইক।’

ওদের দেখাদেখি আমিও রিভলভারটা কিটব্যাগ থেকে বের করে হাতে তৈরি রাখলুম। উত্তেজনায় আমার চোয়াল শক্ত হয়ে এল। লাহিড়ী সেই লাইনটি—ছোট্ট পাড়াগাঁ শিমুলিয়াকে যে



আরবের এক মায়াময় শহর করে তুলেছিল। হঠাৎ আমার বুক কেঁপে উঠল। লাইলি এমনি-এমনি ধরা দেবে তো? না দিলে এরা ওর অত সুন্দর দেহে···ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেললুম।

জীবনে এই প্রথম আমি ধর্মবিশ্বাসী হয়ে ঈশ্বরকে একবার প্রার্থনা জানালুম, লাইলি যেন সহজে আত্মসমর্পণ করে।···

বাসটা আমার স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিল এতক্ষণে। ক্রমশ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ওই বাসে লাইলি আছে। আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকল মুহূর্তে-মুহূর্তে। এই চাকরি নেওয়া আমার উচিত হয় নি। উচিত হয় নি।···

জিপটা যেন লাফ দিয়ে পাশ কাটাল। তারপর সামনে কয়েক হাত তফাত রেখে খুব আস্তে চলতে থাকল। বাসটা হরন্ দিচ্ছিল। আমাদের জিপ আস্তে আস্তে চলে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। বাসটা সশব্দে ব্রেক কষেছে। যাত্রীরা জানলায় ঝুঁকেছে। মুখার্জী দত্ত—আর বাকি সবাই এক লাফে বাসের পিছনের দরজার সামনে ঘিরে দাঁড়াল। হাতে খোলা রিভলবার প্রত্যেকের। বাসের যাত্রীরা কাঠপুতুল হয়ে গেছে। জিপের পিছনের পর্দার একটা ফুটোয় চোখ রেখে সব দেখতে পাচ্ছি।

তারপর দেখলুম, মুখার্জী একলাফে উঠে গেল। দত্ত বাসের তলায় উঁকিঝুঁকি দিতে থাকল। কোন গুলির শব্দ হল না। কোন চিৎকার না। শুধু স্তব্ধতা।

তারপর মুখার্জীর গলা শুনলুম। ক্ষেপে গিয়ে চেঁচাচ্ছে যেন। 'কোথায় নেমে গেল বললে?'

জবাবটা শুনতে পেলুম না। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন।

মুখার্জী ফিরে এসে বলল, 'ভেরি ব্যাড লাক স্যার। অসম্ভব ধূর্ত মেয়ে। আগে যে নদীর ব্রীজটা পেরিয়ে এলুম, ওখানে নেমে গেছে। ওদিকটা তো ভীষণ জঙ্গল। কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম

আছে। এখন আর খুঁজে বের করা অসম্ভব। নাকি গিয়ে একটা চান্স নেব? কী বলেন স্যার?'

'আপনাদের খুশি। আমি কিন্তু বাসটা চলে গেলেই নেমে যাব।'

'শিমুলিয়ায় ফিরবেন—নাকি বহরমপুর?'

'জানি না মিঃ মুখার্জী। ভাববেন না। আমি সময় মত খবর দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

'আমার মনে হয়, আমি থাকা অবধি আপনাদের কোন আলাদা চেষ্টা চালানো ঠিক হবে না মিঃ মুখার্জী। তাতে আমার অসুবিধে হতে পারে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। আই এগ্রি।'

বাসটা চলে গেলে আমি নেমে এলুম জিপ থেকে। ফাঁকা মাঠ দুধারে। কিছু গাছপালা আর পুকুরও আছে ডানদিকে। মুখার্জীরা চলে গেল। সকালের স্মিত রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে একটা সিগ্রেট ধরালুম এতক্ষণে। হালকা হাওয়ায় গায়ের ঘাম জুড়িয়ে গেল। একটা অর্জুন গাছের ছায়ায় গিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়লুম। এত ক্লান্তি কোনদিন আসে নি।

একটু পরে আবার বাতাসে সেই সুগন্ধি ঝাঁঝটা যেন ভেসে এল। লাইলি যা রেখে গেছে আজ কিছুক্ষণ আগে। এই গন্ধটা যেন আমার চারদিকে ঘুরছে। কিছু বলছে—বুঝতে পারছিনে।

এক সময় গ্রীষ্মে কাঠমল্লিকার ফুলের গন্ধ পেলে অনিবার্যভাবে লাইলির কথা মনে পড়ে যেত। ওই গন্ধটার অনুষঙ্গে লাইলির স্মৃতি ছিল জড়ানো।

আজ এই কড়া সেন্টের গন্ধ আরেক লাইলির অনুষঙ্গ তৈরী করল। এ লাইলি অন্য মেয়ে। প্রদীপের স্ত্রী বলে যাকে অতি সহজে মেনে নিয়েছিলুম—অথচ যে মারাত্মক খুনী এবং বিপ্লবী।

দুই

হ্যাঁ, 'বিপ্লবী'। এ ছাড়া অন্য কোন শব্দ সরকারী দপ্তরের গোপন নথিতে ব্যবহার করা হয়নি লাইলি বা তার দল সম্পর্কে। এবং এইটাই আমার কাছে ছিল সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য।

একটা কথা এখানে অবশ্যই পরিস্কার করা দরকার যে এই 'বিপ্লবী' দলটি—যার এক আঞ্চলিক অধিনেত্রী কৃষাণকন্যা এই লাইলি খাতুন, এরা কিন্তু প্রখ্যাত নকশালপন্থী কমিউনিস্ট বিপ্লবী নয়। আমার সদর দপ্তরের নথিপত্রে এটা পরিস্কার ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল। তাছাড়া আমাকে বিশদভাবে এদের কর্মপন্থা আর উদ্দেশ্যও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যতদূর জানা গেছে, এটি একটি নতুন দল। এরা পশ্চিমবঙ্গে এখনও সংখ্যায় অতি সীমিত। প্রধানত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এদের ঘাঁটি। নগরাঞ্চলে দেখা পাওয়ার চান্স খুব কম। এরা প্রধানত যে কাজকর্ম করছে—তা হল, দুর্ধর্ষ লোকদের দলে টেনে দলের শক্তি বাড়াচ্ছে এবং ডাকাতি, ওয়াগন ব্রেকিং, তার কাটা, রাহাজানি থেকে শুরু করে সবরকম উপায়ে এরা অর্থসংগ্রহ করছে। এই অর্থ দিয়ে বাইরে থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার প্ল্যান আছে এদের, এবং দরকার মত অস্ত্র যোগাড় হয়ে গেলেই এই দলটি বিপ্লবের কাজে নেমে পড়বে। সে কাজ কী ধরনের, তাও অনুমান করা গেছে। অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাস, গেরিলা পদ্ধতিতে এবং দরকার হলে সামনা-সামনি লড়াই চালানো। এভাবেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করার স্বপ্ন এরা দেখেছে।

রাণীহাট এলাকায় যে ঘাঁটিটি রয়েছে, তার নেত্রী লাইলি খাতুন। এই এলাকার একটা বিশেষ সুবিধা ওদের কাছে, তা হল: রাণীহাট-

শিমুলিয়ার পশ্চিমে এক বিশাল বিকীর্ণ দুর্গম এলাকা রয়েছে। ছোট-বড় অজস্র নদী সেই অববাহিকার নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হওয়ার দরুণ কোন রাস্তাঘাট এখনও তৈরী করা সম্ভব হয়নি। কিছু এলাকা জলা আর জঙ্গলে ভর্তি—কোন মানুষের বাস নেই। ছোট-ছোট যে-সব গ্রাম আছে, তারা এখনও প্রায় আদিম যুগে বাস করছে। তাদের মধ্যে জেলে, বাগ্দী, সাঁওতাল আর বেদের সংখ্যাই বেশি। এরা ভীষণ গরীব। যারা চাষবাস করে, তাদের ভাগ্যও অনিশ্চিত—কারণ প্রায় প্রতিবছর বন্যা হয়। পঞ্চবার্ষিক যোজনার কোন সুবিধাই ওরা পায় নি। ভোটার-সংখ্যা বেশি হলে হয়তো অন্য কিছু ঘটত—অন্তত আমার তাই ধারণা।

লাইলি আর তার দলের লোকেরা সম্ভবত ওই দুর্গম এলাকাতেই লুকিয়ে থাকে, অর্থাৎ বিশ্রাম আর প্ল্যান করে এবং অ্যাকশনের সময় বেরিয়ে যায় নির্দিষ্ট জায়গায়। হাতে-নাতে কোথাও ধরে ফেলা এদের কঠিন ছিল। কারণ এদের অ্যাকশনের কোন বিশেষ এলাকা নেই। আজ রামপুরহাটে ওয়াগন ভাঙল, তো পরের রাতে জঙ্গীপুরে গিয়ে তার কাটল। তার পর দিন হয়তো হঠাৎ সিউড়িতে ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করে বসল। আশ্চর্য নিপুণ এদের সংগঠন আর হিসেবী চলাফেরা। স্পষ্ট বোঝা যায়, একটা অতিবুদ্ধিশীল মস্তিষ্ক-যন্ত্র এদের পিছনে সক্রিয়—লাইলি শুধুমাত্র যার হাতের পুতুল।

সব কিছুর উৎস অবশ্য কলকাতা শহর। কলকাতার মূল ঘাঁটিটি ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়েছিল। খবরের কাগজে সে-সব অদ্ভুত রোমহর্ষক বিবরণ সবাই পড়েছেন। অন্যান্য অঞ্চলের ঘাঁটিগুলিও প্রায় খতম। শুধু রাণীহাট এলাকা রয়ে গেছে এবং আমার ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম যে এই ঘাঁটিটি খতম করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কর্তাদের মাথা খেলেছিল। আনোয়ার চৌধুরী মুসলমান, লাইলি খাতুন মুসলমান—এবং দুজনেই একই গ্রামের

মানুষ। বিশেষত পরস্পর একসময় পরিচিত। অতএব আনোয়ার চৌধুরীকে পাঠানো মানে রাবণের মৃত্যুবাণ হানা।

কিন্তু তার আগে লাইলির পিছনের কথা আমার জানা দরকার। হঠাৎ একটি পাড়াগেঁয়ে সাধারণ মেয়ে তো আর রাতারাতি এই দুর্ধর্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে বসেনি। নিশ্চয় এর একটা পূর্বাপর সুসমঞ্জস কাহিনী আছে—একটা ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। কে তাকে আনল এই ভূমিকায়? বীরেশ্বর?

শিমুলিয়ায় এসে লাইলি সম্পর্কে কোন কথাই তুলিনি—পাছে কেউ সন্দেহ করে বসে। কারণ, বিশ বছর পরে হুট্ করে সেখানে চলে আসার কোন সঙ্গত কারণ নিজের কাছেই জোরদার হচ্ছিল না। জন্মভূমি দেখতে আসাটা কি খুব বিশ্বাস্য ব্যাপার? বিশেষ করে সেখানে যখন কোনদিক থেকেই কোন যোগসূত্র নেই আমার। এবং এসে লাইলির কথা তুললে সন্দেহ হবার কথা বই কি। লাইলি ছিল অতি নগণ্য একটি ছাগলচরানী মেয়ে। অমন মেয়ে গ্রামে তো অনেক ছিল। হঠাৎ লাইলির কথা কেন? আর লাইলি যে এলাকায় অত প্রখ্যাত বা কুখ্যাত হয়ে উঠেছে, তা নিশ্চয় আমার জানার কথা নয়।

তাই ভেবেছিলুম, সুযোগ বুঝে সুকৌশলে কথাটা তুলতে হবে কারো কাছে। কোন সরল বৃদ্ধের কাছেই। শিমুলিয়ায় তেমন লোক একজনই আছে, সে ফৈজুচাচা। ছেলেবেলায় সে আমাকে খুবই ভালবাসত। সন্ধ্যাবেলায় বাবার ডাক্তারখানায় এসে আড্ডা দিত। সেই আড্ডায় আমি চুপিচুপি দাঁড়িয়ে থাকতুম। কত আশ্চর্য রূপকথা বলতে পারত ফৈজুচাচা! এখন সে ভীষণ বুড়ো হয়ে গেছে। চলাফেরা করতে পারে না। খাটিয়ায় শুয়ে বা বসে থাকে সব সময়। আমাকে দেখে সে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠেছিল।...

*　　*　　*　　*　　*

মুখার্জীদের জিপ চলে গেলে আমি অর্জুন গাছটার তলায় বসে সিগ্রেট খেতে খেতে এইসব কথা ভেবে নিলুম। তারপর উঠে দাঁড়ালুম। কখন কোন ফাঁকে শিমুলিয়ার দিকে যাবার বাসটা চলে গেছে লক্ষ্যই করিনি। কোন খালি রিক্সাও চলছে না এখন।

মাত্র কোয়ার্টার মাইল দূরে বাবুগঞ্জ বাজার। সেখানে গিয়ে একটা রিক্সা পাওয়া যেতে পারে। পিছনে বাতাস পাবে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

পরক্ষণে মনে হল, থাক। শিমুলিয়া যে-কোন সময় যাওয়া যেতে পারে। এদিকে খুব বেশি দিন এখানে কাটালে লাইলির অনুচরদের সন্দেহভাজন হয়ে পড়ব। কাজেই যত তাড়াতাড়ি পারি, আমাকে কাজ শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। এখন যদি আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর ছলে সেই নদীর ব্রিজের কাছে যাই, লাইলির কোন পাত্তা পাওয়া কি সম্ভব ?

আবার আমার গা শিউরে উঠল। আমার বুকপকেটে পরিচিতি-পত্রের সঙ্গে একটা সরকারী আদেশপত্রও রয়েছে। একমাত্র আমিই পারি লাইলিকে দরকার হলে 'মৃত অবস্থায় গ্রেফতার' করতে। হ্যাঁ, 'মৃত অবস্থাতেও গ্রেফতার' বলে একটা কানুন আছে। তার মানে যে-কোন সময় লাইলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই তাকে গুলি করে মারতে পারি এবং এতেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। লাইলি মরলেই এ ঘাঁটি বিধ্বস্ত বলে ধরে নেওয়া হবে।

আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল একথা ভাবতে। ওই আদেশপত্রটার তত গুরুত্ব দিইনি এতক্ষণ। এ মুহূর্তে যতই ব্যাপারটা বাস্তব ঘটনার ছকে ফেলে ভাবলুম, আমার পা দুটো ভীষণ ভারি হতে লাগল। আমার বুকের ওপর কী সাংঘাতিক কালকেউটে নিয়ে আমি ঠাণ্ডা মাথায় ঘুরছি!

লাইলি নাকি অসংখ্য খুনের অপরাধে অপরাধী। আর আমি

'দরকার হলে' লাইলিকে খুন করব। কিন্তু আইন এবং সমাজের চোখে আমি খুনী বিবেচিত হব না!

আর 'দরকার হলে' মানে কী? যদি সে আত্মসমর্পণ না করে, যদি সে আমাকে আক্রমণ করতে আসে।

ভাগ্যের এ এক অদ্ভুত পরিহাস ছাড়া এর অন্য কোন অর্থ খুঁজে পেলুম না। আমার সেই আশ্চর্যসুন্দর দিনগুলিতে যে ছিল আমার একটি গোপন আনন্দময় স্বপ্ন, কৈশোরকে যে ভরিয়ে দিয়েছিল ফুলে ফলে নানারংয়ের ছটায়, পৃথিবী আর জীবনকে যে মেয়ে করে তুলেছিল আমার চোখে স্বর্গের মতন সুখসম্ভব—আজ যৌবনে তাকে হত্যার পরোয়ানা নিয়ে আমি ফিরে এসেছি!

মন খারাপ হয়ে গেল। ফিরে গিয়ে এ চাকরি ছেড়ে দিই। সমাজ, রাষ্ট্র, আইন সব অনেক বড় ব্যাপার। আমি সামান্য মানুষ —আমার ছোট ব্যক্তি-বিবেক খুব ছোট দিক থেকে সব ভাল-মন্দ বিচার করে। কোনদিন আদর্শ সমাজবীর হবার স্বপ্নও আমার ছিল না। নেহাত এক আকস্মিক ঘটনাচক্রে এই চাকরির অফার পেয়েছিলুম। তারপর থেকে অপরাধীদের পিছনে ছায়ার মতন ঘুরে তাদের কব্জা করে ফেলা একটা বিচিত্র খেলার মতন নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল, তাই এ চাকরি করে আসছি। এই লুকোচুরি খেলা, এই নানা রকম মুখোশ পরে বেড়ানো, বাস্তব জীবনের মঞ্চে এইসব অভিনয়—নেহাত নেশা ছাড়া কিছু তো নয়।

আমার মনে এই উল্টো স্রোতটা বরাবর আছে। এটাকে দ্বন্দ্ব বলাই ভাল। কিন্তু তবু কর্তব্যে কোনদিন ফাঁকি দিই নি। নিজের সেই ছোট্ট বিবেকটিকে চড়-থাপ্পড় মেরে চুপ করিয়ে কতদিন কত অপরাধীকে তার প্রিয়তমার বুক থেকে, তার শিশুর সান্নিধ্য থেকে কেড়ে নিয়ে আইনের দরবারে পৌঁছে দিয়েছি—তার সংখ্যা নেই। কলকাতার এক কুখ্যাত অপরাধী তার এক দুর্বল মুহূর্তে তার একমাত্র বাচ্চা মেয়ের অসুখের সময় বাড়ি ফিরে এসেছিল, আমি

সে সুযোগ ছাড়ি নি। সেই মেয়েটির কান্না আমার মনে এখনও জমা রয়েছে। টের পেয়েছিলুম যে যত জঘন্য অপরাধীই হোক, মূলত সে মানুষ—সে কারো না কারো বাবা, ভাই, স্বামী, সন্তান।

বারীনদা বলেন, 'আনোয়ারটা যত দিন যাচ্ছে, দার্শনিক হয়ে উঠছে!' কে জানে! মানুষের জীবনের অন্ধকার দিকটাই দেখতে দেখতে অন্ধকারে হেঁটে চলা আমার কাজ। কিন্তু অন্ধকারচারী মানুষের মধ্যে আলোর আকুতিও তো দেখতে পাই। মানুষ সর্বাঙ্গ-সুন্দর নয়, দেবতা নয়। অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর আর দেবতা হবার সম্ভাবনাও তো তার ছিল। কিংবা প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে দেবতা নেই, তাই বা কে হলফ করে বলতে পারে? একবার দূর থেকে এক মারাত্মক খুনী গুণ্ডাকে অনুসরণ করে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার মোড়ে যেতে যেতে সে একটি ছোট্ট ছেলেকে রাস্তা পার করে দিল! একবার দেখেছি, আরেক খুনী রাস্তার ধারে একটি ফুটপাথজাত বাচ্চাকে গাল টিপে আদর করছে। আরেকবার এক কুখ্যাত অপরাধীকে কতক্ষণ আকাশ-নদী-পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখেছিলুম।

অবশ্য লাইলি কী জানিনে। আমি এখনও চোখের সামনে দেখিনি—তার মধ্যে মানবতা, কিংবা দেবতা, কিংবা সুন্দরের কী আছে। শুধু জানি, সে খুনী, ডাকাত, এবং 'হয়তো বা' বিপ্লবীও। 'হয়তো বা' বলছি, তার কারণ—এই দলটির উদ্দেশ্য আর পন্থা সঙ্গতিহীন। এমনও তো হতে পারে, কোন অসাধারণ মস্তিষ্কবান ব্যক্তি একদল অসামাজিক ধরনের মানুষ বেছে নিয়ে আসলে নিজের ব্যক্তিগত অর্থ লালসা চরিতার্থ করছে!...

এইসব ভাবতে ভাবতে এক সময় দেখি আমি সেই নদীর ব্রিজের কাছে এসে পড়েছি। ঘড়ি দেখলুম, প্রায় দশটা বাজে। রোদ চড়া হচ্ছে ক্রমশ। ব্রিজে এসে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশ বছর আগে এখানে নৌকোয় পারাপার হত। অনেক স্মৃতি ভেসে এল মনে।

বাঁদিকে নদীর দুধারে ঘন জঙ্গল। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জলা আর জঙ্গল ভর্তি। এখানটা উঁচু বলে বাঁদিকে—পশ্চিমে সেই দুর্গম এলাকার অনেকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোনটা কোন গ্রাম বোঝা যাচ্ছে না। ছেলেবেলাতেও ওই এলাকা আমার সম্পূর্ণ অচেনা ছিল।

ব্রিজের একধারে নদীর বাঁধে গিয়ে দাঁড়ালুম। হিজল গাছের ছায়ায় বাতাস দিচ্ছিল। কিটব্যাগের ভিতর থেকে ভিউ-ফাইণ্ডারটা বের করে চোখে রাখলুম। আমি এখন নিছক প্রকৃতিপ্রেমিক—'ন্যাচারালিস্ট'। পাখি দেখারও শখ আছে। বুদ্ধি করে ক্যামেরাও সঙ্গে রেখেছি। যারা শিমুলিয়ার ডাক্তার কামরুল চৌধুরীর ছেলে আনোয়ারকে চেনে না—তাদের জন্যে এই মুখোশ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভিউ-ফাইণ্ডারে দুর্গম বিস্তীর্ণ বনভূমি—একটা ব্যাপক প্রকৃতি-জগৎ আমার সামনে ধরা দিল। কোথাও কোন মানুষ দেখলুম না। জলার ধারে কোথাও-কোথাও কিছু গরু-মোষ চরতে দেখলুম। রাখালরা নিশ্চয় ধারে-কাছে কোথাও আছে। কিন্তু ওদিকটা মোটামুটি ফাঁকা—কোমর-সমান উঁচু উলুখড়ের ধূসর বিস্তার। কোন লোক গেলে এখান থেকেই দেখা যেত।

খুব খুঁটিয়ে নদীর দু'ধারের জঙ্গলগুলো দেখতে লাগলুম। কোন জনপ্রাণী নেই। তখন একটু ইতস্তত করে নদীর ধারে-ধারে হাঁটতে শুরু করলুম।

কতদূর যাব বা লাইলিকে পেয়ে যাব কিনা সবই অনিশ্চিত। তবু এসব ক্ষেত্রে দেখেছি, আমার ইনটুইশান বা সহজাত বোধটা বেশ কাজ করে। সম্ভবত তার হাতের পুতুল হয়ে হেঁটে যাচ্ছি।

নদীতে সোনালি বালির চড়া রয়েছে। একপ্রান্তে কয়েক ফুট চওড়া জায়গায় ঝিরঝিরে কিছু জল বয়ে যাচ্ছে। নদীতে নেমে গেলে কারো চোখে পড়ে কৌতূহল সৃষ্টি করব বলে পাড়ের জঙ্গলের ভিতর

হাঁটতে থাকলুম। ছোট-ছোট কাঁটাঝোপ আর সতেজ নানাজাতের গাছ রয়েছে। ঘন ছায়ায় ভরা বনভূমি আমাকে নির্জনতার প্রশান্তি দিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু এত অস্বস্তির মধ্যে নিসর্গের দিকে মন ছিল না একটুও। টের পাচ্ছিলুম হয়তো বা বোকার মতন কাজ করে নিজের বিপদ ডেকে আনছি। একটা গাছের ছায়ায় থমকে দাঁড়ালুম। হঠাৎ মনে হল, লাইলি বা তার লোকেরা কেউ আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার ওপর নজর রাখেনি তো? বুক কেঁপে উঠল। যদি হঠাৎ কেউ গুলি ছুঁড়ে বসে!

কিন্তু আর ফিরে যেতেও পারছিনে। বনটা আমাকে টানতে শুরু করল। অল্প হাওয়া দিচ্ছিল। পাখি ডাকছিল। বিশ বছর আগের কিছু স্মৃতিও ভেসে আসছিল মনে। তবু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে চারদিক দেখে-শুনে অনিশ্চিত পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে গেলুম। ক্রমশ একটা বিশ্বাস মনে দানা বাঁধতে লাগল যে লাইলি তো আমাকে চেনে, বীরেশ্বর বলেছে এবং আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখাও হয়ে গেছে কিছুক্ষণের জন্যে—সে আমার কোন ক্ষতি করবে না।

বেশ কিছুদূর যাবার পর এই বিশ্বাস পূর্ণতায় স্থির হল। লাইলি আর যাই করুক, তার বাল্যসঙ্গীকে হত্যা করতে গুলি ছুঁড়বে না—যদি কোনভাবে সব টের পেয়েও থাকে।

সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলুম। পাখি দেখার ছলে চোখে বার বার ভিউ-ফাইণ্ডার রাখলুম। ঝোপের বুনো ফুলের সামনে মুগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ভান করলুম। গুণ গুণ করে গানও গাইতে থাকলুম। আমার এই আচরণের সঙ্গে বিশ বছর আগের এক কিশোরের আচরণের কোন পার্থক্য ছিল না। শিমুলিয়ার পীরের থানের সুন্দর নির্জন বনভূমিতে সে ঠিক এমনি বিহ্বলতায় ঘুরে বেড়াত।

সামনে গাছের ডালে একঝাঁক টিয়াপাখি ক্যাচর-ম্যাচর করছিল। একটা ঢিল ছুঁড়ে মারতেই তারা উড়ে গেল। তারপর ওই খেলা শুরু হল আমার।

প্রখ্যাত শিকারী জিম করবেট বাঘ শিকার করতে গিয়ে নানা-রকম লুকোচুরি খেলতেন বাঘিনীর সঙ্গে। তাঁরও একটা ইনটুইশন ছিল—যাতে আড়ালের প্রাণীটার সব সতর্ক চলাফেরা বা অবস্থিতি ঠিকঠাক টের পেয়ে যেতেন। একটা দুর্ধর্ষ বাঘিনীকে অনেক ছলে গুলি করার সুযোগ ব্যর্থ হলে অবশেষে তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরম কৌশলটি প্রয়োগ করেছিলেন। তখন বাঘদেব মিথুনঋতু। আসঙ্গলিপ্সু মত্তা বাঘিনীটাকে তিনি পুরুষবাঘের ডাক নকল করে সামনে এনে গুলি করে মেরেছিলেন। এ হয়তো মারাত্মক অন্যায়—অনৈতিক, কিন্তু তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। বাঘিনীটা কয়েকশো লোককে খুন করেছিল। বেঁচে থাকলে আর কত লোক তার হাতে মারা পড়ত।

আজ আমার ভূমিকা ঠিক একই। কিন্তু আসঙ্গলিপ্সু মত্তা সেই বাঘিনীটার সঙ্গে লাইলির কোন মিল তো নেই!

নাকি আমি বিশ্বাস করেছি যে লাইলি আমাকে দেখামাত্র ছেলেবেলার সেই হারানো ভালবাসার তীব্র টানে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার বুকে? সে-স্মৃতি কি তার মনে গেঁথে আছে?

যদি থাকে, তাহলে আমি সার্থক হতে পারি এবং তাইলেই আমার কণ্ঠের জিম করবেটের সেই ছলনা-ডাক শুনে তার ছুটে আসবার চান্স আছে।

হ্যাঁ, জিম করবেটের সেই ইনটুইশন আমার মধ্যেও কাজ করছিল তখন। গভীরতর ইন্দ্রিয়ে একটা চাপা উত্তেজনা ছিল—প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, লাইলি এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। আবছা মনে হচ্ছিল—সে এখন কোন গাছের ছায়ায়, কোন ঝোপের পাশে চুপি চুপি আমাকে লক্ষ্য করছে। সারা বনভূমি ক্রমশ ছম-ছম করতে থাকল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায়। এমন কি আমি যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম, দুর্গম সবুজের ঘন দেয়াল কাঁচের মতন স্বচ্ছ হয়ে উঠছিল—ওর চোখের দৃষ্টি, ভুরুর কাঁপন, বুকের

ওঠা-পড়া—সব যেন ভেসে উঠছিল। সে যেন ভাবছিল, আনোয়ার এখানে কেন—কী করছে এই জনহীন বনভূমিতে? আমার গতি-বিধির ওপর নজর রাখছিল যেন সে।...

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে গাছের নিচে দাঁড়ালুম একসময়। সব মিথ্যে। আমি হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হচ্ছি সম্ভবত। লাইলি কতক্ষণ আগে নদীর ব্রিজের কাছে নেমেছে, তারপর যে এদিকেই এসেছে—তার কী মানে আছে? উল্টোদিকের কোন গ্রামেও তো গিয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু সেই বোধটা কিছুতেই গেল না আমার। লাইলি এদিকেই এসেছে—এই বনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। বীরেশ্বরের বাড়ি গিয়ে একটুর জন্যে বেঁচে গেছে আজ। এবার সে খুব সতর্ক হয়ে পড়বে।

একই সময়ে বীরেশ্বরের বাড়ি বিশ বছর পরে আনোয়ারের উপস্থিতিটা কি সে নেহাত আকস্মিক বা কাকতালীয় বলে মেনে নেবে এখন?

কোথায় ঘুঘু ডাকছিল। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ে বসলুম। পরক্ষণে চাপা গলায় ওদিক থেকে কে হয়তো মুখখিস্তি করে উঠল—ভাষাটা দুর্বোধ্য।

চমকে উঠেছিলুম। কিটব্যাগের ভিতর রিভলবারে হাত চলে গিয়েছিল। তারপর দেখলুম একটা অদ্ভুত মূর্তি বেরিয়ে এল সামনের ঝোপের ওদিক থেকে। মাথায় রঙীন ন্যাকড়া পেঁচানো, তার ওপর ছোট ছোট পাতায়-ভরা ডাল গোঁজা রয়েছে। খালি গা। হাঁটু অবধি ময়লা কাপড় মালকোঁচা করে পরেছে। পায়ে তালশাখার অদ্ভুত জুতো। হাতে একটা ছোট্ট লাঠি।

সে আমাকে দেখেই চমকে উঠল। তক্ষুনি হাত তুলে সেলাম বাজিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'মাফ করবেন হুজুর—হামি আপনাকে গালি দিইনি। হামি ভাবলম, রাখাল আছে। ঢিল ছুঁড়ল তো হামার সব বরবাদ হয়ে গেল।'

লোকটা একটা মুসহর—ফাঁদ পেতে পাখি ধরছে এখানে। ছেলেবেলায় দেখেছি এরা বাংলাদেশের বাইরে থেকে দল বেঁধে আসে এবং রাস্তার ধারে গাছতলায় ঘরকন্না পাতে। পাখি ধরে, ইঁদুর-সাপ-ব্যাঙ মারে, কেউ ওষুধ বিক্রি করে—তারপর বর্ষার মুখে পাত্তাড়ি গুটিয়ে কোথায় চলে যায়।

হেসে বললুম, 'কী পাখি ধরছ সর্দার ?'

সর্দার বললে এরা খুব খুশি হয়, জানতুম। লোকটা খুশি হয়ে বলল, 'জী হুজুর, যাকে ঘু-ঘু বলেন আপনারা—হামরা বলি ঢু-ঢু।'

"কোথায় আছ তোমরা, সর্দার ?'

'জী হুজুর, বাবুগঞ্জের কাছে।'

ওকে একটা সিগ্রেট দিয়ে বললুম 'আমি শিমুলিয়ার লোক—শিমুলিয়া চেনো তো ? এখন অবশ্য কলকাতায় থাকি। অনেকদিন পরে বেড়াতে এসেছি দেশে। তুমি পাখি ধর, আর আমি দেখি—এই যে দূরবীনটা দেখছ, এতেই। ছাখো না, চোখে রেখে ছাখো।'

সে কৃতার্থ হয়ে সিগ্রেটটা কানে গুঁজল। তারপর সাবধানে সযত্নে ভিউ-ফাইণ্ডার নিয়ে চোখে রাখল। পরক্ষণে এক হাতে পাছা চাপড়াতে আর হাসতে লাগল আনন্দে। অব্যক্ত দুর্বোধ্য শব্দে সে আনন্দ প্রকাশ করছিল। তারপর সেটা দুহাতে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বড় বড় দাঁতে হেসে রইল নিঃশব্দ বিস্ময়ে।

বললুম, 'ঢিল ছুঁড়ে পাখি উড়িয়ে দিয়েছি তোমার। কী করব বল ? জানতুম না তো! নাও, সিগ্রেট ধরিয়ে ফেল। তারপর চল দেখি কোথায় তোমার ঘু-ঘু ধরার ফাঁদ। অন্য কোথাও পাতা যাবে বরং। কী বল ?'

সিগ্রেট ধরিয়ে দিলে সে প্রায় নাচতে নাচতে এগোল। একখানে দেখি, উঁচু ঝোপের গায়ে একটা ক্যামাফ্লেজ-করা খাঁচা ঝুলছে, ওপরে

একটা ছোট্ট মোটা কাঠি রয়েছে, তার ওপর একটা ছোট্ট জাল। খাঁচায় পোষা ঘুঘুটা ডেকে উঠছে বার বার। বুনো ঘুঘু সেই ডাক শুনে উড়ে এসে কাঠিতে বসলেই উল্টে পড়ে যাবে এবং তক্ষুনি জালটা তাকে ঢেকে ফেলবে।

কী চমৎকার ব্যবস্থা! জিম করবেটের সেই মরণ-ডাক, আমার সেই ভালবাসার স্মৃতির ফাঁদ। হঠাৎ কিছুক্ষণ সব খারাপ লাগল।

ফাঁদটা নিয়ে আরো গভীর জঙ্গলে গেলুম দুজনে। এক জায়গায় পেতে দিয়ে সে আমাকে ইশারা করল সরে আসতে। খানিক দূরে গাছপালার ছায়ায় আমরা বসলুম। খাঁচার পাখিটাকে ডেকে ওঠার জন্যে সে মৃদু-মৃদু শিস দিতে থাকল। ধুরন্ধর বজ্জাত পাখিটা ঠিকই ডাকতে শুরু করল—ঘু ঘু ঘু···ঘু ঘু ঘু। নির্জন বনভূমিতে সেই ডাকের গভীর মায়ার কোন তুলনা নেই।

চাপাগলায় ওর সঙ্গে কথা বলা শুরু করলুম। 'এবার কেমন পাখি ধরার মরশুম, কোথায় পাখি বেচে, কত দাম পায়, তার বউ-ছেলেপুলে আছে কি না, তারপর—কতক্ষণ সে এখানে এসেছে, আর কেউ তার পাখি ধরা পণ্ড করেছে কি না, এই জঙ্গলে বাঘ আছে কি না—কারো সঙ্গে দেখা না হলেই পাখি ধরা নিরাপদ, কিন্তু হঠাৎ বেমাক্কা আমার মত কেউ এসে পড়তেও তো পারে···কোন মেয়ে এসে পড়লে—বিশেষ করে কোন সুন্দরী ভদ্রমহিলা যদি হঠাৎ এসে পড়ে তো সে কি তাকে ভূত-প্রেত-পরী ভেবে বসবে—ইত্যাদি।

লোকটা হুঁ দিয়ে যাচ্ছিল আর মৌজ করে সিগ্রেট টানছিল। আমার শেষ কথাটায় সে নড়ে বসল। হলুদ দাঁত বের করে তাকাল আমার দিকে।···'জী হুজুর, হাঁ—হাঁ। ঠিক বাত—বিলকুল ঠিক।'

'কেন? কী ব্যাপার?'

হ্যাঁ—একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে একটু আগে সে থ হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে আড়াল থেকে বেরোয় নি। কী জানি, জিনপরী না মানুষ—

সাহস হয়নি তার। সে বিড়-বিড় করে মন্তর-তন্তর পড়ে নিজেকে অদৃশ্য বেড়ায় ঘিরে ফেলেছিল ভাগ্যিস। তার জীবনে এমন কখনও চাক্ষুষ করেনি সে। ফাঁদ গুটিয়ে তক্ষুনি পালিয়ে যাবে ঠিক করেছিল। কিন্তু তারপর সে টের পেল যে বিলকুল আদমি আছে। কারণ, একটু পরেই এক ভদ্দর আদমি—আমার মতনই পোশাক, হাতে বন্দুক ভি আছে, ঔরতটার পিছু পিছু বেরিয়ে এল। মুসহর ভাবল, এখন হঠাৎ ওদের সামনে বেরিয়ে পড়লে চমকে গিয়ে কী জানি বন্দুকবাজী করে বসে—তাই আড়ালে থেকে গেল। হাতে যার বন্দুক আছে, জঙ্গলে তাকে চমকে দিতে নেই—মুসহর তার জঙ্গলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এটা জানে। অনেকবার ঠেকে শিখেছে। তো বন্দুক না থাকলে সে নিশ্চয় আলাপ করতে যেত—সিগ্রেট চেয়ে নিত।···

আমি গুম হয়ে গেলুন। যা ভেবেছিলুম, তাই। কিন্তু লাইলির সঙ্গে সে কে? বীরেশ্বর কি?

একটু বসে থেকে উঠে পড়লুম···'ঠিক আছে সর্দার। পাখি ধরো। ততক্ষণ আমি একটু ঘুরে বেড়াই।'

যেদিকে ওরা গেছে বলছিল, সেদিকে সতর্কভাবে পা বাড়ালুম। সামান্য কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি কী একটা চক চক করছে শুকনো ঘাসের ওপর। কুড়িয়ে নিলুম। চকোলেটের মোড়ক! কে এখানে চকোলেট খেতে পারে লাইলি ছাড়া? তীক্ষ্ণদৃষ্টে চারপাশে মাটি পরীক্ষা করতে লাগলুম। তারপর একটা গাছের নিচে চোখ গেল। ধুঁয়ো! দৌড়ে গিয়ে দেখি, একটা সিগ্রেটের ফিলটার অংশ পুড়ছে। তার মানে এখানে বসেছিল এইমাত্র—উঠে গেছে। বুক কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে।

সামনের ঝোপ ঠেলে যেই এগিয়েছি, অমনি সেই জঙ্গল কাঁপিয়ে তীব্র ঝাঁঝালো শব্দে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল হঠাৎ। তারপর কে হিন্দী গান গেয়ে উঠল।

অবস্থা ও পরিবেশ অন্যরকম হলে একটুও চমকানোর কিছু

ছিল না। হ্যাঁ, ট্রানজিস্টার বেজে উঠল কোথাও। তার মানে মানুষ আছে। ওরা কি ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছে—এত বোকা হতে পারে ওরা ?

যদি ট্রানজিস্টারটা ওদেরই হয়, তাহলে বুঝব, বীরেশ্বর বা লাইলি সেই জিপের ব্যাপার একটুও ধরতে পারেনি এবং আমার আসা কোন সন্দেহের উদ্রেক করেনি ওদের মনে। কিংবা নাকি এখানে ওরা নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করছে ?

আওয়াজ লক্ষ্য করে কয়েকপা এগিয়ে দেখি, হা কপাল ! একটা লোক মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে, মালকোচমারা গামছা পরনে, হাতের লম্বা লাঠিতে ভর করে ত্রিভঙ্গ ঠামে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কোমরে একটা ক্ষুদে ট্রানজিস্টার ঝুলছে। সামনের দিকে একটা ফাঁকা ছোট্টমতন জলা—সেখানে বুক ডুবিয়ে একদল মোষ দাম চিবুচ্ছে।

লোকটা গোয়ালা। বিশবছর পরে বাংলার পাড়াগাঁয়ে এইসব ব্যাপার চলছে তাহলে ! আমার ভীষণ হাসি পেল।

ওকে এড়িয়ে গেলুম। ও নির্ঘাৎ এই এলাকার লোক। নানাদিক থেকে ভেবে ওর সামনে গিয়ে পড়াটা সঙ্গত মনে করলুম না।

অনেকটা ঘুরে আবার সেই পায়ে চলা সরু পথটায় উঠলুম। আবার একটা চকোলেটের মোড়ক পড়ে থাকতে দেখলুম। মোড়কটা মিলিয়ে দেখলুম, লাল ঝাপসা অক্ষরে একই কোম্পানীর নাম লেখা রয়েছে। তাহলে ঠিক পথেই চলেছি, যে-কোন মুহূর্তে বাঘ ও বাঘিনীর দেখা পেয়ে যাব।

আবার থমকে দাঁড়াতে হল। কিন্তু তারপর ?

লাইলি একা থাকলে নিঃসঙ্কোচে তার সামনে গিয়ে হাজির হতে পারতুম। কিন্তু বীরেশ্বর তার সঙ্গে রয়েছে। অবস্থা কী যে দাঁড়াবে, কিছু বলা যায় না।

কাঁপুনিটা আবার পেয়ে বসল। উত্তেজনায় বুক ঢিপ ঢিপ

করতে থাকল। শরীর দারুণ ভারি মনে হল। তারপর একটা প্রবল ঈর্ষা আচমকা ছুটে এল আমার মনে। লাইলি-বীরেশ্বর, বীরেশ্বর-লাইলি···দাঁতে দাঁত চেপে বসল। আড়াল থেকে ছুটোকেই তো শেষ করে দিতে পারি। ওরা জানতেও পারবে না কে ওদের মারল!

আবার এগিয়ে গেলুম সতর্ক দৃষ্টিতে। আবার থমকে দাঁড়ালুম। মনে হল, থাক—এখনও সময় আছে। ফিরে যাই। নতুন প্ল্যান ছকে শুরু করি। এই জঙ্গলে ওরা যে আজ নতুন এল না—তা বুঝতে পারছি। সম্ভবত নথিতে যে সন্দেহ করা হয়েছে, তা ঠিক—এখানেই ওদের দলের রেঁদেভ্যু। বৈঠক বা সিদ্ধান্ত যা কিছু হয়—সব এখান থেকেই। অতএব ছদ্মবেশী একটা পুলিস-বাহিনী নিয়ে এখানে ওৎ পেতে থাকাই ভাল হবে। কেউ পাখি-ধরা ব্যাধ সাজবে, কেউ রাখাল, কেউ কাঠুরিয়া, কিংবা জেলে-বাগ্দী, কিংবা উলুখড় কাটতে আসা মজুর।

সেই সময় আবছা একটা হাসির শব্দ কানে এল। দু'পা এগিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে যেতেই টের পেলুম ওপাশে কোথাও কারা অনুচ্চস্বরে কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। ওখানে মাথার ওপর বড় বড় গাছ—নিচেটা ঝোপজঙ্গলে ভর্তি। হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপটার ভিতর ঢুকে পড়লুম। কয়েক ফুট অতি কষ্টে এগোতেই ওধারটা নজরে এল।

কয়েক বর্গমিটার ফাঁকা ছায়াভরা ঘাসের জমি। একটা প্রকাণ্ড অথচ নিচু গাছের ঝাঁকড়মাকড় ডালপালা মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। একটা ডালে বসে আছে দুটিতে। পাশাপাশি। পা ছুঁয়ে আছে মাটিতে। একটা উঁচু বেঞ্চের মত ডালটা। পাশে একটা বন্দুক—উঁহু, রাইফেল খাড়া হয়ে আছে। বীরেশ্বরের পরনে ঘিয়ে রংয়ের প্যাণ্ট, গায়ে ধূসর একটা অগোছাল শার্ট, কোমরে বেল্ট। একটা হাতে ছোট্ট ডাল ধরে আছে সে, অন্য হাতটা লাইলির কাঁধে রেখে

অস্ফুটস্বরে কী বলছে আর দুজনেই হেসে উঠছে। লাইলি হাসতে হাসতে ওর বুকের ওপর ঝুঁকে আসছে।

কিন্তু এ লাইলির চেহারা অন্যরকম। আমার মাথায় 'প্রদীপের স্ত্রী'র ছবিটি ছিল। তন্মুহূর্তে তাই চিনতে পারিনি। গায়ের রংটা আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। একটু তামাটে মনে হচ্ছে। চুলগুলোয় সে-খোঁপা নেই। বেণী ঝুলছে। শাড়ি আর জামাটাও অগোছাল, একটু ময়লা—সস্তা দামের আটপৌরে জিনিস। এখন লাইলির শরীরে, তার মুখ-চোখে যে বন্যতা দেখছি, তার সঙ্গে 'প্রদীপের স্ত্রী'র কোন মিল নেই।

অনেক মেয়েকে দেখেছি চৌরঙ্গী এলাকায়, সারা গায়ে পেণ্ট করে ঘোরে। হঠাৎ ধরা যায় না। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে তবে বোঝা যায়, ওটা স্বাভাবিক চামড়ার রঙ নয়। লাইলি আজ আমার চোখকে ফাঁকি দিয়েছিল।

এখন তাকে এই অরণ্যজগতে প্রকৃতির একটা অংশ বলে মনে হল। আস্তে আস্তে পা গুটিয়ে বসে পড়লুম। কনুই ভর করে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে রইলুম ওদের দিকে।

এত আস্তে ওরা কথা বলছে যে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু হেসে উঠলে হাসিটা শোনা যাচ্ছে মাত্র। মনে হল, যেন বা আমাকে নিয়েই ওরা হাসাহাসি করছে। আর আমার রক্তে ঈষৎ উষ্ণতা জেগে উঠল।

এবার দেখি, লাইলি মুখটা বাড়িয়ে দিতেই বীরেশ্বর মুখ এগিয়ে দিচ্ছে—আমার দিকে বীরেশ্বরের মাথা, তাই ব্যাপারটা আমার দৃষ্টির আড়ালে ঘটল। প্রায় দুমিনিট ধরে গাছের মত নিস্পন্দ জড়াজড়ি করে ওরা চুমু খেল।

যেন নিজের অজানতে কিটব্যাগ থেকে আমার হাতে উঠে এল রিভলবারটা। পাঁচটা গুলি ভরা আছে। সেফটি ক্যাচটাও তুলে দিলুম। একটা অন্ধ আদিম শক্তি আমাকে গ্রাস করে ফেলছে টের

পেলুম। অসহায় হয়ে নিজের ঘাতক রূপটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। মহাকবি বাল্মিকীর মত শোকার্ত একটা বোবা চিৎকার আমার মনের অন্তদিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখলুম—মা নিষাদ…

হঠাৎ গলার কাছে খুব ঠাণ্ডা টের পেতেই দেখি একটা লাউডগা সাপ আমার কাঁধ বেয়ে বুকের ওপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসাড় পাথর হয়ে গেছি।…

তিন

সাপটা চলে যাবার পরও দীর্ঘ কয়েক মিনিট নিস্পন্দ বসে রইলুম। তারপর প্রচণ্ড ঘাম হতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেছে। দারুণ জলতেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু সেই নদী ছাড়া আর কোথাও জল পাবার আশা হয়তো নেই। জল খেয়ে ঘুরে এসে যদি ওদের হারিয়ে ফেলি।

আবার তাকিয়ে দেখি, বীরেশ্বর একই ভঙ্গীতে ডালে বসে রয়েছে। লাইলি তার সামনে দাঁড়িয়ে কী বলছে। তারপর সে তার ব্লাউজটা খুলে ফেলল—বীরেশ্বরের দিকে পিঠ রেখে। বীরেশ্বর মৃদু হাসছে আর সিগ্রেট টানছে। এতক্ষণে ওদের পায়ের কাছে আমার চেয়ে বড় একটা কিটব্যাগ দেখতে পেলুম। লাইলি হেঁট হয়ে তার চেন খুলে একটা শাড়ি, তোয়ালে আর কী সব বের করতে লাগল। স্নান করবে নাকি? এখানে জল কোথায়?

তোয়ালেটা বুকে জড়িয়ে সে পরনের শাড়িটা খুলে ফেলল। লাল সায়াটা রয়ে গেল। তারপর বীরেশ্বরও দেখি শার্ট খুলল, গেঞ্জি খুলে ফেলল, তারপর প্যাণ্টও। পরনে শুধু আণ্ডারপ্যাণ্ট রয়ে গেল। তার বিশাল বলিষ্ঠ শরীরটা দেখতে লাগলুম।

লাইলি তার বুকে একটা হাত রেখে কী বলে একটু ঠেলে দিতেই সে লাইলিকে দুহাতে শূন্যে তুলে নিল। লাইলি হাসছিল। তার বুকের তোয়ালেটা কাঁধ থেকে খসে পড়ল। তার সুডৌল স্তনদুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বীরেশ্বর তাকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে আবার চুমু খেতে লাগল। তারপর সেই অবস্থায় ওদিকে এগিয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে চলে যেতেই অদৃশ্য হল ওরা। সেই সুযোগে বেরিয়ে এলুম ঝোপ থেকে। বাঁদিকে ঘুরে প্রায় বুকে হেঁটে একটু গিয়ে দেখি সামনে একটা ছোট্ট ডোবা—কিন্তু সুন্দর

স্বচ্ছ কালো জলে ভরা। ডাইনে ওরা কোথাও আছে। দেখা যাচ্ছে না। জল দেখে তেষ্টাটা আবার বেড়ে গেল। কিন্তু জল খেতে গেলেই নির্ঘাৎ আমাকে ওরা দেখে ফেলবে।

কতক্ষণ সেই রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ক্রুদ্ধ আর হিংস্র জানোয়ারের মতন বসে ছিলুম হিসেব নেই। হঠাৎ দেখি, দুজনে হাত-ধরাধরি করে বেরিয়ে এল। তারপর জলে নামল। লাইলি জল ছিটোতে থাকল বীরেশ্বরের গায়ে। বীরেশ্বরও ওকে ধরে ফেলল।

জলের মধ্যে দুটি প্রাণীর সুখের শব্দ বাজতে থাকল। কতক্ষণ ধরে ওরা খেলা করল। স্বচ্ছ জলটা ঘুলিয়ে গেল।

কিন্তু ও জল তো আমার পক্ষে মুখে তোলা আর অসম্ভব। আমি উপুড় হয়ে মাটিতে চিবুক রেখে দেখতে থাকলুম নিঃশব্দে। তখন আমার আর কোন উত্তেজনা নেই, চমক নেই। সব অনুভূতির বাইরে চলে গেছি। সব পূর্বাপর ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে, আমি যেন রূপকথার সেই নির্বোধ রাজপুত্র—যে রাক্ষস-রাক্ষসীর জিয়ন-কাঠি-মরণকাঠি আনতে গিয়ে বারণ না শুনে পিছু ফিরে তাকিয়েছিল এবং তক্ষুনি পাথর হয়ে গেছে। আমি পিছু ফিরে তাকিয়েছি বইকি।...

অথচ একটা চমৎকার সুযোগ চলে যাচ্ছিল। এখন খুব সহজে দুটো কাজ আমি করতে পারতুম। চুপি চুপি পিছন ঘুরে সেই আধশোয়া গাছটার কাছে বীরেশ্বরের বন্দুকটা হাতাতে পারতুম এবং লাইলির ব্যাগ খুলে কোন রিভলবার থাকলে সেটাও সামলে দেওয়া হত। এ হল এক নম্বর। তারপর ওদের সামনে হাজির হয়ে অস্ত্র তাক করে আদেশ দিতুম—ভালমানুষের মত চুপটি করে আমার আগে-আগে চল হাইওয়ের দিকে। নৈলে কুকুরের মত গুলি করে মারব। ওরা প্রাণের ভয়ে আমার হুকুম তামিল করতে বাধ্য হত তখন রাস্তা দিয়ে বাবুগঞ্জের থানার দিকে ওদের নিয়ে যেতুম। এই হচ্ছে দু নম্বর। কিন্তু এই দুনম্বরটা যে এক নম্বরের মত সোজা

নয় এবং কতখানি সার্থক হত, সংশয় দেখা দিল। এখান থেকে পাকা রাস্তা অর্থাৎ ব্রিজটা কমপক্ষে দেড় মাইলেরও বেশি দূর। জঙ্গলে যে ওরা কোন অনুচরকে পাহারায় রাখেনি, তার ঠিক কী? তাছাড়া জঙ্গলের মধ্যে তেমন ফাঁকা পথ নেই। একজনকে সামলানো হয়তো যায়, কিন্তু দুজনকে অসম্ভব। গাছপালা ঝোপঝাড় ঘাস ঠেলে এগোতে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে—লক্ষ্য স্থির রেখে এগোন যাবে না প্রতিমুহূর্তে। তখন সে-সুযোগ ওরা যে কেউ একজন নিতে পারে। ধরা যাক, ব্রিজ অবধি পৌঁছনো গেল। কিন্তু তারপর? যেতে হবে রাণীরহাটের সামনে দিয়ে। ব্রিজ থেকে বাবুগঞ্জ কমপক্ষে মাইল পাঁচেকের কম নয়।

ভীষণ ঝুঁকির ব্যাপার আছে। যত এসব ভাবলুম, শরীর ক্লান্ত লাগল তত, আর নিজের অসহায়তায় নিজের ওপর ক্ষেপে যেতে থাকলুম।

একসময় বীরেশ্বর জল থেকে উঠে পড়ল। তোয়ালেটা ঝোপের ডগা থেকে নিয়ে গা মুছল। তারপর ওদিকে চলে গেল। লাইলি এখন একা। মগজে ধু-ধু আগুন জ্বলে উঠল আমার। লাইলির পরনে মাত্র সায়া—বাকিটা মুক্ত। মনে হল গ্রীক ভাস্কর্য দেখছি। এই আশ্চর্য সৌন্দর্য আমার চোখে অজানতে মোহ সৃষ্টি করছিল। এখন লাইলির হৃৎপিণ্ডে গুলি ছুঁড়ে মারলেই আমার কর্তব্য চুকে যায়। কিন্তু তা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। একজন ঘুমন্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার বুকে গুলি ছোড়া যা, এও তো তাই। সামনা-সামনি ডুয়েলে হয়তো সবই পারা যায়। কিন্তু আর যাই হই, আমি তো ভাড়াটে খুনী নই। বিশেষত অত সুন্দর যৌবনময় দেহে—নগ্ন দেহে মৃত্যু ছুঁড়ে দেবার মত ঘাতক পৃথিবীতে কেউ থাকতে পারে না।

লাইলি গুন গুন করে কী গান গাইতে গাইতে উঠে এল। তারপর ডাকল, 'বীরু, তোয়ালে কই?'

বীরেশ্বর দৌড়ে এল।...'ভুলে গিয়েছিলাম। নাও। ঝটপট। দেরী করো না।'

'ক'টা বাজল?'

'এগারো প্রায়।'

'তাহলে এখনও অনেক দেরী। সন্ধ্যা ছ'টায় তো?'...হঠাৎ ফিক করে হাসল লাইলি।...'এই, চান করলেই আমার যে ক্ষিদে পেয়ে যায়!'

বীরেশ্বর একটু হাসল।...'বেশ তো। তোমার মামুর ওখানে খাবে। বলা আছে।'

লাইলি হাসতে লাগল।...'মামু ঝাঁটাপেটা করবে হয়তো। কতদিন যাব-যাব করে গেলুম না। অথচ ওদের বাড়ির পাশেই কতবার মিটিং করে এলুম। এই বীরু! মামু কাল বাবুগঞ্জ গিয়েছিল কেন, খবর নিয়েছ তো?'

বীরেশ্বর বলল, 'হুঁ-উ। কোদাল কিনতে গিয়েছিল। সুরেন ছিল পিছনে। ভোলানাথ হার্ডওয়ার স্টোর্সে কোদাল কিনল। তারপর এক পোঁটলা আম কিনে বাসে উঠেছিল। তুমি ভেবো না।'

লাইলি কয়েক মিনিট ধরে চুল ঝাড়ল। তারপর ভ্রূভঙ্গী করে বলল, 'এই! তোমার লজ্জাসরম বলতে কিছু নেই? আমার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ যে! চলে যাও—আমার লজ্জা করছে!'

বীরেশ্বর জিভ কেটে সরে যাচ্ছিল।

লাইলি ডাকল, 'শোন। ওখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাক আর আমার কথার জবাব দাও—কেমন?'

বীরেশ্বর পিছন ফিরে দাঁড়াল সকৌতুকে।...'হুঁ, বল।'

'আনোয়ারের ব্যাপারটা খুলে কিছু বলছ না কেন?'

'বলার মতন কিছু নেই। মনে হল, বেড়াতেই এসেছে। সেটাই

অবশ্য স্বাভাবিক ওর পক্ষে। একটুও বদলায় নি। সেই ক্ষ্যাপাটে উদাস-উদাস ভাব'...বীরেশ্বর হাসতে লাগল।

'আমাকে একটা ঠিকানা দিয়েছে।'

'হুঁ—বললে তো।'

'লক্ষ্মীটি, একবার কলকাতায় মৃগেনবাবুকে খবর দাও না। খবর নিক।'

'কার? আনোয়ারের?'

'হুঁ। আমার কী রকম লাগল যেন।'

'কেন?'

'জীপের ব্যাপারটা কেমন-কেমন লাগে না তোমার?'

'ও নিছক অ্যাক্সিডেন্টাল। আনোয়ার বেচারা কী করবে?'

'বীরু, একটা কথা ভাবছি।'

'কী?'

'আনোয়ারের সঙ্গে আমি দেখা করব।'

বীরেশ্বর এত জোরে হাসল যে মাথার ওপর গাছের ডাল থেকে ডানা ঝটপট করে একটা পাখি উড়ে পালাল।...'লাইলি, তোমার বাল্যপ্রেমের স্মৃতি উথলে ওঠেনি তো?'

'হয়তো উঠেছে।'...লাইলি মুখ টিপে হাসল।...'জান বীরু, ও আমাকে একবার চেপে ধরে চুমু খেয়ে ফেলেছিল? তখন আমি সবে—মানে, বুকটা ঢাকব কিনা ভাবতে শিখেছি!'

'সর্বনাশ!'

'হুঁ-উ। সর্বনাশ বই কি। কতদিন চুপি চুপি কাঁদতুম জান? ভালবাসায় নয়—কী যেন দুঃখে। মনে হত, অসহায় পেয়ে ডাক্তারের ছেলে আমার কাছ থেকে ভীষণ—ভীষণ কী দামী জিনিস কেড়ে নিয়েছে!'

'লাইলি, আর নয়। এস।...'

বলে বীরেশ্বর হঠাৎ চলে গেল ঝোপের পিছনে। লাইলি বড়

তোয়ালেটা বুকে ও কোমরে জড়িয়ে সায়া খুলল। নিংড়ে জল বের করল। ঝাড়ল। তারপর পাড়ে গিয়ে রোদ দেখে ঝোপে মেলে দিল।

বুঝলুম, না শুকোনো অবধি এখান থেকে ওরা যাবে না। আমি যেখানে উপুড় হয়ে ছিলুম, সেখানেই চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলুম। আমার মনের ভিতর আরও তোলপাড় শুরু হয়েছিল। লাইলি একটা মারাত্মক জায়গা খুঁচিয়ে দিয়েছে :

সেই চুমু খাওয়া। ভুলেই গিয়েছিলুম ব্যাপারটা। ও মনে পড়িয়ে দিল। হ্যাঁ, পীরের মাজারের কাছে হঠাৎ আবেগে চুমু খেয়ে ফেলেছিলুম বটে। ওর দেহটাও প্রার্থনা করেছিলুম ফিসফিসিয়ে। কী লজ্জা! এখন লজ্জা হচ্ছে। আমার বয়স তখন অত কম!

কিন্তু সেটা চেপে গেল লাইলি। বীরেশ্বরের সঙ্গে তার একেবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—পরস্পর ওরা পরস্পরের কাছে সততা দাবী করে বলেই মনে হল। তাই হয়তো ওটুকু চেপে গেল।

পোকার সুড়সুড়িতে থাকা গেল না। মাথায় মাকড়সার জাল জড়িয়ে গেছে। খুব সাবধানে বেরিয়ে এলুম। প্রায় বুকে হেঁটে আগের জায়গায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম, লাইলি দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনী চালাচ্ছে। বীরেশ্বর প্যাণ্ট শার্ট পরে তৈরী হয়েছে। তার আণ্ডার-প্যাণ্টটাও শুকোচ্ছে রোদে। বীরেশ্বর বন্দুকটা নাড়াচাড়া করতে থাকল।

চাপা স্বরে কথা বলছিল ওরা। ভালভাবে শোনার জন্যে আরও একটু কাছে গেলুম।

'…হরেনদা আসছেন না কিন্তু।'…বীরেশ্বর বলছিল।…'স্রেফ তোমার দায়িত্ব। দুপুর বেলায় গ্রামটা নির্জন হয়ে থাকে—কোন চিন্তার কারণ নেই। শচীন রহমান সায়েবের জীপটা ম্যানেজ করবে। তুমি যাচ্ছ—এ্যাজ ইফ, মেয়েদের সার্চ করার জন্যে তোমাকে আনা হয়েছে। শালা রাজেন মণ্ডল বাড়িতে সোনার

পাহাড় জমিয়ে রেখেছে—খাঁটি খবর আছে কিন্তু। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক—দেখলেই ভয় পেয়ে যাবে। ওরে বাবা, একেবারে সেণ্ট্রাল গভর্মেণ্টের লোক! দেখবে, হেগে-মুতে এক কাণ্ড করবে শালা! কত লোককে সর্বস্বান্ত করে যখ হয়েছে—ওকে যদি তোমরা খতম করেও দাও, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি—পার্টি কোন কৈফিয়ৎ চাইবে না।'

'…সব বুঝলুম।'…লাইলি বলল।…'কিন্তু…।'

'কিন্তু কী?'

'আমার প্রস্তাবটার কী হল?'

'ও। ভেবে দেখি। আজ মিটিংয়ে তুলব বরং।'

লাইলি যেন বিরক্ত হল।…'নিজের চেনা লোকের সঙ্গে দেখা করব, তাতেও পারমিশান লাগবে। মিটিংয়ে পাস করিয়ে নিতে হবে!'

'লাইলি, ভুলে যেও না—তুমি পার্টির একটা অংশ। নিজের খুশিমত…'

'কোনদিন কি খুশিমত কিছু করেছি?'

'আহা, করনি। কিন্তু আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করার রিস্ক আছে ভাবছ না?'

'কোন রিস্ক আছে কি না, সেটাই তো দেখতে চাই।'

'ঠিক আছে। সবাই ভেবে দেখি সেটা। ভুলে যেও না—তোমাকে রক্ষা করার জন্যে পার্টির প্রত্যেকটি সেল সারাক্ষণ সজাগ রয়েছে। তুমি তাদের নেত্রী বটে—কিন্তু…'

'এ নেতৃত্ব আমি চাইনে! অন্যের মত থাকতে চাই। বাবা! একটুও স্বাধীনতা নেই!'

'কী মুশকিল! আজ আবার পাগলামি শুরু করলে! মাঝে মাঝে হঠাৎ তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায় কেন বল তো?'

লাইলি চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'একটা সত্যি কথা বলব বীরু?'

'নিশ্চয় বলবে।'

'তোমাদের বিপ্লব-টিপ্লব কী' আমি বুঝিনে। ওসব নিয়ে মাথাব্যথা আমার নেই। হানিফের দলে বেশ ছিলুম—তুমিই আমাকে তোমার পার্টিতে টেনে আনলে। কী সব করে যাচ্ছি, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারিনে। টাকাকড়ি মালপত্তর সব আসে, কোথায় চলে যায় কার কাছে। খুব অবাক লাগে মাঝে মাঝে। হানিফভাইয়ের ব্যাপার ছিল সোজা। টাকা পেত—স্ফূর্তি ওড়াত। কলকাতা গিয়ে কাটিয়ে আসতুম মাঝে মাঝে। কোন দায়-ঝক্কি নেই। ব্যাস! আর এ কোথায় এনে ফেললে! আমি বোবার মত কাজ করে যাচ্ছি—শুধু হুকুম তামিল! এ আমার ভাল্লাগে না বীরু।'

'লাইলি, আজ তুমি আবার গোলমাল করে ফেলছ সব। পার্টি এগুলো বরদাস্ত করবে না। অন্য কেউ বললে আমিও বরদাস্ত করতুম না। কিন্তু তুমি—তুমি আমার···'

'থামলে কেন? বল। ভালবাসার পাত্রী—প্রেমিকা!'

'নয় লাইলি?'

লাইলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে গাছের পাতা ছিঁড়তে লাগল।

'লাইলি, জবাব দাও।'

'আমি তোমাকে ভালবাসতুম বলেই চলে এসেছিলুম তোমার কাছে। এ তো সোজা ব্যাপার, বীরু। নৈলে থেকে যেতুম কলকাতায়।'

'হঠাৎ এইমাত্র কী এমন ঘটল লাইলি, যে এখন আমাকে ভালবাসতে পারছ না?'

একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। লাইলি ধুপ করে বীরেশ্বরের কোলে বসে পড়ল। তারপর ওরা গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আমাকে পাগল করে রেখেছ বীরু। এত ভালবাসার সুখ আমাকে কেউ দিতে পারে নি।'

'হানিফগুণ্ডা পারে নি ?'

লাইলি ওর চিবুকে ঠোনা মেরে বলল, 'এই মা। হিংসে হয়েছে গো। হানিফভাইকে গুণ্ডা বলছে। জান, হানিফভাই আমার বাপের বয়সী ? ছিঃ, বীরু। বেচারা আমি পাশে থাকলে অমন বেঘোরে মারা পড়ত না। কক্ষনো না। আমি বাতাসে গন্ধ পাই বিপদের। যেই আমি চলে এলুম, অমনি লোকটা মারা গেল। আমি জানি, কে মেরেছে ! কিন্তু আর কী হবে ! অনেক দূরে সরে এসেছি।'

'ওঠ—কাপড় শুকিয়েছে বোধহয়। তোমাকে তোমার মামুর ওখানে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরব। আবার টাইমলি এসে পড়ব। ততক্ষণ খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে নিও।'

দুজনে উঠে কাপড় তুলে আনল। ব্যস্তভাবে গোছগাছ করতে থাকল। আমার সারা শরীর ততক্ষণে ব্যথায় আড়ষ্ট। কিন্তু এত কাছে যে নড়ার উপায় নেই।

মনে মনে তবু প্রসন্ন আমি। অনেক তথ্য পাওয়া গেল—যা পুলিসের রেকর্ডে অজ্ঞাত। তাছাড়া আমার সঙ্গে লাইলির দেখা করার তীব্র ইচ্ছেটাও টের পেলুম। একটা আশার আলো দেখলুম। লাইলি যদি আগে অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের ব্যবস্থা করে, তাহলে তো সহজেই কাজ চুকে যাবে। লোকজন তৈরী রাখব। কিন্তু আপাতত তার কোন সম্ভাবনা দেখছিনে। তার পার্টির অনুমতি ছাড়া কি লাইলি দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে ? অনুমতি দেবার আগে নিশ্চয় ওদের কলকাতার সেল সবিশেষ খবর নেবে আমার সম্পর্কে। জানি না, কী খবর যোগাড় করতে পারবে তারা। ধরা যাক, তেমন সন্দেহজনক কিছু নেই বলে রিপোর্ট পাঠাল। তারপর অনুমতি দিল লাইলিকে। লাইলি জেনেছে, আমি স্বভাবত শিমুলিয়ায় উঠেছি। সেখানে সে হঠাৎ উপস্থিত হতেও তো পারে !

ওরা চলতে শুরু করেছে। আমি সাবধানে বেরিয়ে এলুম।

বেশ কিছুটা দূরে থেকে অনুসরণ করলুম। ওরা নিশ্চয় কাছাকাছি কোন গ্রামে যাচ্ছে। জঙ্গল শেষ হলেই মুশকিলে পড়ব। তবে দূর থেকে গ্রামটাও দেখে নিতে পারি।

ক্রমশ জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে। এখন জায়গায় জায়গায় কিছু ঝোপঝাড় আর বাকিটা বুক-সমান উঁচু কাশের বিস্তার। কোথাও উলুকাশ কেটে নেওয়া হয়েছে—সেখানে ফাঁকা। তার পিছনে একটা উঁচু বাঁধ দেখা যাচ্ছিল। ভরসার কথা, কোথাও কোন লোক নেই। উলুকাশের বনটার কাছে এসে চোখে বাইনাকুলার রাখলুম। দেখলুম ওরা দুজনে হাত-ধরাধরি করে বাঁধে উঠল। একটু দাঁড়াল, বাঁধের ওপারে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। খুব উঁচু হলুদ মাটির বাঁধটা আকাশের গায়ে মিশে রয়েছে।

পরক্ষণে দেখি, কে একজন ওদের সঙ্গে কথা বলছে। গ্রামের চাষাভুষো লোক বলে মনে হল। লোকটা এদিকে আসতে লাগল। ওরা বাঁধের ওপাশে অদৃশ্য হল। আমার পক্ষে এখানে দাঁড়ানো আর নিরাপদ নয়। পিছিয়ে এসে জঙ্গলে ঢুকে পড়লুম। একটা উঁচু গাছ খুঁজছিলুম। পেয়েও গেলুম। অনেক কষ্টে গাছটায় উঠে সবচেয়ে উঁচু ডালটায় গেলুম। তারপর বাইনাকুলারে চোখ রেখে বাঁধের ওপারটা পুরো দেখতে পেলুম। নদীটা ওখান দিয়ে বেঁকে গেছে। নদীর ওপারে ঘন গাছপালার ভিতর কিছু কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। লাইলি আর বীরেশ্বর গাঁয়ে ঢুকল। তারপর আর তাদের দেখা গেল না।

যে লোকটা এদিকে আসছিল, তার হাতে একটা লম্বা কাটারি। দেখলুম সে এক জায়গায় ঝোপ কাটতে ব্যস্ত হয়েছে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকার পর গাছ থেকে নেমে এলুম।···

মাথায় কিছু চমৎকার প্ল্যান এসেছিল। সন্ধ্যায় নির্ঘাৎ ওই গাঁয়ে লাইলিদের পার্টির বৈঠক বসেছে। ওই সময় তাদের ঘিরে

ফেলা যায়। সংঘর্ষ অবশ্যই হবে। কিন্তু ওরা স্বভাবত হেরে যাবে এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে।

কিংবা আরেকটা কাজ করা যেতে পারে। লাইলির সেই 'মামু'র বাড়িটা খুঁজে বের করার জন্যে এলাকার কোন বিশ্বস্ত ইনফরমারকে কোন ছলে সেখানে পাঠানো চলে। সে খবর আনলে ওদের বৈঠকের অনেক আগে সশস্ত্র পুলিস গিয়ে লাইলিকে ঘিরে ফেলতে পারে। হাতে এর জন্যে যথেষ্ট সময়ও ছিল।

কিন্তু সব প্ল্যান ঘুলিয়ে দিল লাইলির সেই কথাটা: 'আনোয়ারের সঙ্গে আমি দেখা করব।'

এই শব্দগুলো অবিশ্রান্ত আমার মাথার ভিতর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মনে হল, সুযোগ অজস্র পাব লাইলিকে গ্রেপ্তারের—কিন্তু তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আর তাকে মুখোমুখি কোনমতে তো পাব না। তখন সে হয়ে উঠবে খাঁচায় ভরা হিংস্র বাঘিনী।

আমার মনে এখন শুধু তীব্র তাগিদ লাইলির সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবার—শুধু ব্যাকুলতা, কেন সে এমন হল, কী সেইসব ঘটনা-পরম্পরা, এগুলো জানবার।

আরও কিছু ছিল হয়তো অবচেতনে। স্মৃতিগত কোন আকর্ষণ, কিংবা কোন ব্যক্তিগত কামনা—যা অচরিতার্থতার দারুণ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট।

শিমুলিয়ায় পৌঁছে ফৈজুচাচার ঘরে সারা দুপুর সারা বিকেল এক অদ্ভুত অলস তন্ময়তায় কেটে গেল। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলুম না। জঙ্গল এলাকার চমৎকার একটা ম্যাপ ছকে ফেলেছিলুম কাগজের পাতায়। সেটা অর্থহীন মনে হল।

হঠাৎ মনে পড়ল, ওরা কোথায় যেন কোন রাজেন মণ্ডলের বাড়ি সরকারী লোক সেজে গিয়ে ডাকাতি করবে। কবে? কোথায় বাড়ি এই রাজেন মণ্ডলের? রহমান সায়েবের জীপ নিয়ে যাবে শচীন। শচীন আর রহমান সায়েব কে?

আমার কর্তব্যবোধ বাঘের মতন ঘুম থেকে জেগে বসল। না—জেনে-শুনে এসব ক্ষেত্রে চুপচাপ বসে থেকে চেপে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে। তাছাড়া এর শুধু চাকুরীগত দায়িত্ব ছাড়াও মানবিক দায়িত্বের দিকটাও তো আছে। রাজেন মণ্ডল ধনী গৃহস্থ—কারো ধনবান হওয়াটা আমার কাছে খুব অপরাধজনক বিবেচিত নয়। সবাই তো ধনবান হতে চায়। বীরেশ্বরও তো মোটামুটি ধনবান। তার বেলা ?

ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। অন্তত বাবুগঞ্জ থানায় খবর পৌঁছে দিতে পারলে ওরা সদরে সব বেতারে জানিয়ে দেবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সদর কোয়ার্টারের 'বুদ্ধি বিভাগ' লোকজন পাঠিয়ে সব খুঁজে বের করতে পারবে। লাইলি এবং তাদের দলবলকে বিধ্বস্ত করার জন্যে এ জেলায় বিশেষভাবে ঘাঁটি আর ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে।

ফৈজুচাচা বারান্দায় খাটিয়ায় শুয়েছিল। আমাকে বেরোতে দেখে বলল, 'আবার কোথায় চললে বেটা ? অত ঘোরাঘুরি করলে অসুখে পড়বে যে।'

'আসছি, চাচা। একবার বাবুগঞ্জ ঘুরে আসি। শুনলুম, খুব বড় জায়গা হয়ে উঠেছে। দেখতে সাধ হচ্ছে।'

ফৈজুচাচা হাসতে লাগল।...'বেটা আমার নিজের দেশে এসে পাগল হয়ে উঠেছে। তাই তো বলছিলুম বাবা, ডাক্তার সায়েবের মতন এখানেই থেকে যাও। বিয়ে-সাদী করে বউ নিয়ে এস। শহরে কি মানুষ থাকতে আছে ? খালি ইটপাথর !'

'সন্ধ্যার মধ্যেই এসে পড়ব।'...বলে বেরিয়ে গেলুম।

পাকা রাস্তায় গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বাস পাওয়া গেল। বসবার জায়গা ছিল না, দারুণ ভিড়। দেখতে-দেখতে যাব ভেবে পাদানির কাছে দাঁড়ালুম। এখন সঙ্গে কিটব্যাগটা নেই। প্যান্টের পকেটে অস্ত্রটা আনতে সাহস পাই নি। কারণ আমার রিভলবারটা

৺৮ ক্যালিবারের এবং প্যান্টের পকেটকে বাইরে থেকে সন্দেহজনক করে রাখে।

তাই একটুখানি দ্বিধা থেকে গেল মনে। পাদানিতে আমাকে দাঁড়ানোর সুবিধে দিতে বাস-অ্যাসিস্ট্যান্টটা একটু তৎপর হয়েছিল। হয়তো আমার চেহারায় শোভন নাগরিকতার ছাপ দেখেই।

সে বলল, 'আরামসে দাঁড়ান স্যার।' এবং নিজে সরে এল। আমি হ্যাণ্ডেল ধরে বাইরে ঝুঁকে দাঁড়ালুম। একটা কারণ ছিল। ব্রিজের কাছটা লক্ষ্য করা।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ব্রিজটা। যত কাছে গেলুম, তত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সেটা। সেই সময় মনে হল, কয়েকটি লোক সেখানে বসে রয়েছে। তারপর স্পষ্ট বীরেশ্বরকে চিনতে পারলুম। আশ্চর্য ওদের সাহস তো!

ব্রিজের কাছে যেতেই বাসের ঘণ্টা বেজে উঠল। বাসটা দাঁড়াল। এখানে এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় কে নামবে? পাদানি ছেড়ে নেমে দাঁড়াতে হল আমাকে। দুজন যুবক নামল। দুজনেই প্যান্ট-শার্ট পরা, কাঁধে কিটব্যাগ। চোখে গগলস। মাথায় কিন্তু সোলার টুপি। একজনের হাতে গোলাকার চামড়ার কেস—ভিতরে মাপের ফিতে, অন্যজনের হাতে একটা স্ট্যাণ্ড—ক্যামেরা স্ট্যাণ্ডের মত, ভাঁজ করে খবরের কাগজে জড়ানো। অ্যাসিস্ট্যাণ্টটা বলল, 'এই যে স্যার, এটাই আপনাদের সেই জায়গা।'

বাসের ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা কি ইরিগেশান ডিপার্ট থেকে আসছেন?'

একজন যুবক মৃদু হেসে মাথা দোলাল।

'তাহলে বাঁধটা সত্যি হচ্ছে, স্যার?'...ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।...'ওহে নকড়ি, তাহলে দরখাস্তটা কাজে লাগল। স্যার, আপনারা ক্যাম্প করছেন তো এখানটায়? কাল আসব স্যার। আমার নাম নৃপেন সামন্ত। আদাইপুরে বাড়ি।'

ওদিকে অ্যাসিণ্ট্যাণ্ট বাসের ছাদ থেকে ত্রিপল-জড়ানো ছুটে বোঁচকা নামাল। একটা বড় কালো বাক্স নামাল। তারপর বলল, 'আপনাদের সঙ্গে লোক নেই স্যার? এই তেপান্তরে এখন লোক কোথায় পাবেন?'

'লোক পাবার তো কথা ছিল!'...চিন্তিতভাবে ইরিগেশানের লোক দুটো এদিক ওদিক তাকাল।

ব্রীজের অন্যপাশে বীরেশ্বর ও সেই লোকগুলো বসে ছিল। আমি বললুম, 'ওখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা নন তো?'

অ্যাসিস্ট্যাণ্টটা বলল, 'ওনারা তো ভদ্দরলোক, স্যার। মোটঘাট বইবার লোক কই?'

ড্রাইভার বাজখাঁই চ্যাঁচাল। ...'এই লখে! তোর হল? মাতব্বরী করা চাই!'...পরক্ষণে স্টার্ট দিল বাসটা।

পাদানিতে এক পা রেখেছি, হঠাৎ বীরেশ্বরের আওয়াজ পেলুম, 'আনোয়ার, কোথায় যাচ্ছ?'

পা নামিয়ে নিলুম। বাসটা গড়াচ্ছে, অ্যাসিস্ট্যাণ্টটা বলল, 'যাবেন না স্যার?'

জবাব দিলুম, 'থাক।'...বলে পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে এগিয়ে গেলুম। ও হাত নাড়ল। অর্থাৎ, লাগবে না। এই সিকিমাইল বয়ে আনার ভাড়া আমার মতন ফিটফাট সায়েব-মানুষের কাছে নেবার মত আহাম্মুকী ওর নেই, বোঝা গেল।

বাসটা চলে গেলে দেখি বীরেশ্বর ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।...'কোথায় যাচ্ছিলে?'

সোজা হেসে বলে দিলুম, 'তোমার কাছেই। শিমুলিয়ায় একদম থাকতে ভাল্লাগল না। কথা বলার মত কেউ তো নেই! তাই ভাবলুম, আজও যখন থেকে যেতে হল—ফৈজুচাচা ছাড়ল না মোটে, তখন বীরুর কাছেই যাই। আড্ডা দিয়ে আসি। তা এখানে কী করছ?'

বীরেশ্বর বলল, 'এই যে দেখছ! এনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। আর বোল না, নদীর ওপারে অনেকটা জমি আছে পৈতৃক। বাঁধের অভাবে পড়ো হয়ে রয়েছে। তাই'···বলে সে হ্যাটধারীদের দিকে এগোল।···'নমস্কার স্যার! সেই দুপুর থেকে অপেক্ষা করছি। আর একটু দেখেই আমরা ফিরে যেতুম। কই রে পাঁচু, এদিকে আয় তোরা! স্যারদের জিনিসগুলো ওঠা।'

তিনটি লোক তখনও বসেছিল ব্রীজের ওপাশের নীচু চত্বরে। দৌড়ে এল। গ্রাম্য লোক বলেই মনে হল। গায়ে শার্ট, পরনে ময়লা ধুতি, পায়ে স্যাণ্ডেল। কিন্তু তিনজনের দেহই বেশ সুগঠিত। যা বোঝবার, আমি তো স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম।

বীরেশ্বর বলল, 'বুঝলেন স্যার? গাঁয়ের লোক একদম কো-অপারেট করবে না বুঝতে পারছি। তাদের ধারণা, বাঁধ হলে বড়লোক জোতদাররা লাভবান হবে—তাদের কী? একটা লোক পেলুম না যে আপনাদের সাহায্য করবে। অগত্যা আমার ক্লাবের ছেলেদের আনতে হল। দেখছেন তো, সবাই একেকটা ছোট দৈত্য।'···খুব হাসতে লাগল সে।···'এ একরকম ভালই হল, স্যার। আপনারা এ ব্রিজ গুপড়াতে বললে তাও গররাজী হবে না। না কী রে পাঁচু? রঘু কী বলিস? আর সতু—তোর কী মত?'

ইরিগেশানের একজন হ্যাটধারী বলল, 'ক্যাম্প করবার জায়গা ঠিক হয়েছে বীরেশ্বরবাবু?'

বীরেশ্বর বলল, 'হয়েছে স্যার। ওই যে ওখানটায়—উঁচু টটান মত। জঙ্গল আছে। তবে এক্ষুনি সাফ করে ফেলবে এরা। কোন অসুবিধে হবে না। পাঁচু, তোরা এগো বাবা। আমরা কথা বলতে বলতে যাই। এসো আনোয়ার।'

ব্রিজ পেরিয়ে ওধারে গিয়ে জঙ্গলের দিকে নামলুম আমরা। বীরেশ্বরদের মিটিংয়ের সঙ্গে এসবের কোন যোগাযোগ আছে কি না বুঝতে পারছিলুম না। এই দুটি লোক কি সত্যি ইরিগেশান বিভাগ

থেকে এসেছে? যদি নাই এসে থাকে, অর্থাৎ দলের লোকই হয়—তাহলে এত হই-চই লোক দেখানো ব্যাপার কেন? ওদের কি আরও কোন গোপন প্ল্যান আছে—যা আমি জানিনে?

নদীর পাড়ের ওপর জায়গাটা সত্যি অপূর্ব। পাঁচুরা আগাছা ওপড়াচ্ছে, ঝোপঝাড় কাটছে, ভীষণ ব্যস্ত। শোলার টুপিধারীরা চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখছে।

বীরেশ্বর একটা সিগ্রেট দিল আমাকে।...'এস আনোয়ার, এখানে বসি।'

ঘাসের ওপর বসে পড়লুম দুজনে। বললুম, 'বাঁধের জরীপ হবে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'...বলে বীরেশ্বর কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'এসেছ যখন—ক'দিন থেকেই যাও। শিমুলিয়ায় খারাপ লাগলে আমার বাড়ি চলে এসো।'

হেসে বললুম, 'কাল রাতে বা আজ সকালে তো এ অফার দাও নি বীরু। অথচ মনে মনে তাই চেয়েছিলুম, তোমার দিব্যি। মনে খানিকটা দুঃখও হয়েছিল।'

বীরেশ্বর হাসল না। চিন্তিত দেখাচ্ছিল ওকে। বলল, 'তাই বুঝি! হ্যাঁ—বলি নি। কারণ ছিল তখন।'

'কী কারণ, শুনি?'

বীরেশ্বর তেঁতো মুখে বলল, 'তোমাকে খুলেই বলি। কাল রাত্রে ফের শালা আই-বিরা আমাকে জ্বালাতে এসেছিল। এই ইরিগেশানের লোক সেজে এসেছিল। আমার চোখে ধোঁকা দেবে? আমি অমন কত টিকটিকি পুড়িয়ে খেলুম।'

'আই-বি! সেকী! কেন?'

'তোমাকে তো সবই বলেছি। লেফটিস্ট পলিটিক্স করতুম—সেই অপরাধ। অথচ কবে থেকে সব ছেড়েছুড়ে বাবার বিষয়-সম্পত্তিতে মন দিয়েছি। তবু গন্ধ গেল না গা থেকে। কাল রাতটা

মনে মনে বড্ড উত্যক্ত ছিলুম ভাই। তাই তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতেও পারি নি। মন সর্বক্ষণ অন্য জায়গায় ব্যস্ত থাকলে যা হয়।'

'তারপর কী হল শেষ অবধি?'

'কী হবে!'···বীরেশ্বর সিগ্রেটটা ঘাসে গুঁজে বলল, 'এসেছিল—চলে গেল। যাকগে আমি খুব রিলিফের মধ্যে আছি। একটু আগেই ভাবছিলুম, তোমার কথা—যাব নাকি একবার শিমুলিয়ায়। কিন্তু এদিকে এনাদের আসবার কথা।'

মনে ছটফটানি নিয়ে বললুম, 'এখান থেকে এখন উঠবে তুমি?'

'একটু দেরী হবে। কেন, এখানে ভাল লাগছে না তোমার? বসো না কিছুক্ষণ। বাড়ি সময়মত ফিরব। এসব নদীনালা মাঠ-ঘাট জঙ্গল তো তোমার ভাল লাগার কথা।'

ইরিগেশানের দুজনে তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত ওদিকে। ছোট্ট তাঁবু। ক্যাম্পখাটও রয়েছে দুটো। রান্নাবান্নার সরঞ্জাম রয়েছে। হঠাৎ মাথায় এল, এঁদের পিওন বা আর্দালী বেয়ারা সঙ্গে অবশ্যই থাকবার কথা। কই? মুখ বুজে থাকতে পারলুম না। বললুম, 'বীরু, এঁদের সঙ্গে আর্দালী দেখছিনে যে?'

তক্ষুনি বীরেশ্বর চমকে গিয়ে বলল, 'আরে তাই তো! ও স্যার, আপনাদের বেয়ারা আর্দালী আনেন নি কেন? রান্নাবান্না এসব কে করবে?'

প্রথম হ্যাটধারী হেসে বলল, 'জঙ্গলে যাচ্ছি শুনেই আমার বেয়ারার জ্বর। মিঃ দাশগুপ্তের বেয়ারার আমাশা। হঠাৎ লোক পাই কোথায় তখন? বলে এসেছি অফিসে। আগামী কাল বিকল্প লোক এসে যাবে। তাছাড়া অন্যান্য স্টাফও আসবে।'

দাশগুপ্ত বলল, 'সেনগুপ্ত মরীয়া হয়ে চলে এল—আমি একটু ইতস্তত করছিলুম। ও বলল, বীরেশ্বরবাবু যখন আছেন, ভাবনা নেই। আগাম গিয়ে তো বসে পড়া যাক্।'

বীরেশ্বর বলল, 'হ্যাঁ—তা ভাবনা নেই। এরা তিনজনই থেকে যাবে আপনাদের কাছে। বন্দুক আনবেন বলেছিলেন, আনেন নি স্যার? বাঘ-টাঘ এখানে আছে কিন্তু।'

দাশগুপ্ত মাথা দোলাল।…'হুঁ-উ। আমার আবার শিকারের শখ প্রচণ্ড।'

সেনগুপ্ত বলল, 'আমারও। রিয়েলি, বেশ চমৎকার জায়গা এটা কিন্তু। বাঘ থাক বা না থাক, প্রচুর পাখি রয়েছে। কাজের দিনগুলো ভাল কাটবে। কাল-পরশুর মধ্যে আরও দুচারজন মিনিয়াল স্টাফ এসে যাচ্ছে। তখন আর কোন অসুবিধে হবে না।'

দুজনে এতক্ষণে দুটো বন্দুক বের করল। বিকেলের আলো কমে আসছে। একটু দূরে বসে রয়েছি বলে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম না বন্দুক দুটো কী—আইনী কিংবা বে-আইনী। আইনী কি না সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন টের পেল—ও দুটো নিছক নিরীহ পাখিমারা ভদ্রলোক বন্দুক নয়—সম্ভবত বিদেশী জিনিস, এবং হয়তো বা এক বিশেষ গড়নের রাইফেলই। এ ধরনের রাইফেল আমি ইতিপূর্বে দেখেছি বলে মনে পড়ল। আমার গায়ে কাঁটা দিল সঙ্গে সঙ্গে।

বীরেশ্বর ঘড়ি দেখল হঠাৎ।…'ঠিক আছে স্যার, আমি তাহলে আজকের মত উঠি। আমার লোকেরা রইল। কোন অসুবিধে হবে না। কাল ভোরে এসে পড়ব'খন। পাঁচু, তোরা রইলি, কেমন? এস আনোয়ার।'

এবার দাশগুপ্ত এগিয়ে এসে বলল, 'এঁকে তো চিনলুম না।'

বীরেশ্বর আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার বাল্যবন্ধু। আনোয়ারুল চৌধুরী। বহুকাল আগে ওই গাঁয়ে ওদের বাড়ি ছিল। এখন কলকাতায় থাকে। জন্মভূমির কথা মনে পড়েছে এতদিনে।' …সে হেসে উঠল।

আমরা পরস্পর নমস্কার করলুম।

বীরেশ্বর অন্তরঙ্গভাবে আমার হাতটা নিয়ে বলল, 'আনোয়ারকে স্যার তাই বলে আমার দলে ফেলবেন না। ও নিরীহ ছাপোষা মানুষ, আমার মত জেলখাটা দাগী নয়, রাজনীতিরও ধারে-কাছে মাড়ায় না। কিন্তু বড্ড বাতিক আছে পদ্য লেখার। তাই না আনোয়ার?'

সেনগুপ্ত বলল, 'তাই বুঝি? আপনি তাহলে পোয়েট? আই লাইক টু রিড পোয়েমস। কোন কাগজে লেখেন?'

বিব্রত মুখে বললুম, 'না—না। তেমন কিছু না।'

বীরেশ্বর আমাকে টানতে টানতে ব্রিজে গিয়ে উঠল। তারপর হাতটা ছেড়ে দিল। বলল, 'আমার ওখান থেকে এসে আর কোথায় ঘুরলি?'

তার মুখে তুই সম্বোধন শুনে খুশি হলুম। বললুম, 'বাবুগঞ্জ গেলুম। তারপর এই ব্রিজের কাছে নেমেছিলুম বাস থেকে।'

বীরেশ্বর যেন চমকাল।…'তাই নাকি? হঠাৎ এখানে কী?'

'এমনি। দেখতে ইচ্ছে হল নদীটাকে।'

'হুঁ! জঙ্গলে ঢুকেছিলি নাকি? তোর আবার প্রকৃতি-ট্রকৃতির কী সব ব্যাপার আছে। নাকি সেগুলো আর নেই মাথায়? নেচার-নেচার করে কী তর্ক করতিস মনে পড়ে?'

'পড়ে। এখনও রোগটা মাথা থেকে যায় নি রে বীরু। দুপুরে জঙ্গলে কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও গেছি। একটা মুসহরের সঙ্গে দেখা হল। তার পাখি ধরা দেখলুম।'

বীরেশ্বরকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বলল, 'বাঃ! কিন্তু অমন করে জঙ্গলে যাওয়া তোর ঠিক হয় নি। আজকাল একজোড়া বাঘের উপদ্রব হয়েছে। খুব জ্বালাচ্ছে।'

তুই তো ভাল শিকারী। মারছিস না কেন?'

'পারছি কই? আজ দুপুরে তো আমিও এসেছিলুম জঙ্গলে। বলে নি মুসহরটা? দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে।'

'না তো।'...অবাক হবার ভঙ্গী করে বললুম, 'কী আকাট! আমি জানতে পারলে কী আনন্দ না হত রে! কাল বেরোবি বীরু? তাহলে তোর সঙ্গে আসতুম বরং। জঙ্গলে বেড়ানোর মত আনন্দ আর কিছুতে নেই, ভাই।'

বীরেশ্বর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'তা আসিস। কিন্তু বাঘ মারতে গেলে আমি কাকেও সঙ্গে নিইনে। অন প্রিন্সিপল্। বাঘ মারা তো পড়েই না—নিজেকে বা সঙ্গীকে বাঁচানো কঠিন হয়।'

তুজনে এইসব এলোমেলো কথা বলতে বলতে হাঁটছিলুম রাস্তায়। সূর্য ডুবে গেল রাণীহাট পৌঁছতে। হঠাৎ বীরেশ্বর বলল, 'আচ্ছা আনু, তোর লাইলিকে মনে পড়ে?'

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। বললুম, 'লাইলি...লাইলি... ওঃ হো। হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে। সে তো আমাদের গাঁয়ের মেয়ে ছিল। মৌলবীর কাছে পড়ত, মাঠে ছাগলও চরাত। বেশ ফরসা রং, চেহারাটা মোটামুটি সুন্দর...'

বীরেশ্বর হেসে বলল, 'মোটামুটি সুন্দর কী—সুন্দরীই বল্।'

'তাই হল। সেই লাইলির কোথায় বিয়ে হয়েছে রে? আমার একটুও মনে ছিল না তো ওর কথা—আশ্চর্য!'

'হুঁ, আশ্চর্য বটে!'...বীরেশ্বর হাসতে লাগল।

'কী হল? হাসছিস যে?'

সে হঠাৎ আমার কাঁধে একটা আলতো ঘুষি মেরে বলল, 'আনোয়ার! তুমি শালা বড্ড ন্যাকামি করতে পার দেখছি।'

আমার বুকে হাতুড়ি পড়তে লাগল। বললুম, 'কেন, কেন বীরু?'

'উরে শালা!'...বীরেশ্বর বিকট হেসে উঠল।...'এক সময় মেয়েটার পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরত—ভালবাসাবাসির খেলায় চাঁছু আমার লাইলির মজনু সেজে বসেছিল—আর বলে কি না, কই, মনে তো পড়ে না লাইলিকে!'

আশ্বস্ত হয়ে বললুম, 'যাঃ—অত কিছু নয়। তা, কোথায় আছে রে সে?'

বীরেশ্বর অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'হচ্ছে বই কি।'...মিটিমিটি হাসতে হল আমাকে।...'অত বলছিস যখন। এতকাল পরে এলুম—সব দেখে যাব, আর বাল্য-প্রণয়িনীকে দেখে যাব না একবারটি?'

বীরেশ্বর হঠাৎ দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই এখানে আসার পর কিছু শুনিস নি লাইলি সম্পর্কে?'

'লাইলি সম্পর্কে? না তো? বললুম না—ওকে ভুলেই তো গিছলুম।'

'শিমুলিয়ার লোকে কেউ কিছু বলে নি? তোর ফৈজুচাচা?'

'না তো। তোর দিব্যি।'

'আশ্চর্য তো!'...বীরেশ্বর কী যেন ভাবতে লাগল।

'কেন? লাইলির কী ব্যাপার?'

বীরেশ্বর হাঁটতে লাগল...'সব বলছি, চল্! লাইলি এখন এ এলাকায়—শুধু এ এলাকা কেন, সারা জেলাতেও বলতে পারিস, এক প্রখ্যাত কিংবা কুখ্যাত মেয়ে।'

'সে কী!'

'চল্, ঘরে গিয়ে সব বলব।...'

বাড়িতে পৌঁছে গত রাত্রে যে ঘরটায় ছিলুম, সেই ঘরের দরজা খুলে দিল বীরেশ্বর। তারপর ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই অন্যবেশে ফিরল। বলল, 'আনু, এক কাণ্ড হয়ে গেছে রে। পিসিমার হঠাৎ অসুখটা বেড়ে গেছে। এখনই আমাকে একবার বাবুগঞ্জ দৌড়তে হবে, ভাই! এখানেও ডাক্তার আছে। কিন্তু বাবুগঞ্জের ডাক্তারই ওঁর চিকিৎসা করছেন। তুই ততক্ষণ বিশ্রাম কর। বই-টই পড়—আলমারির চাবি দিয়ে যাচ্ছি। আমি ঘণ্টা দুতিনের মধ্যেই ফিরব। কোন অসুবিধে হবে না। লোক আছে—বলা রইল। তোকে চা-টা দিয়ে যাবে।'

সে বেরিয়ে গেল। একেবারে শিকারীদের পোশাক পরনে। হাতে বন্দুক। বাইরে মোটর সাইকেলের শব্দ শুনলুম। মোটর সাইকেল আছে বীরেশ্বরের। আলমারি ভর্তি বই রয়েছে। বীরেশ্বরের বাবার পারিবারিক লাইব্রেরী। এক সময় ওরা জমিদার ছিল। আলমারি খুলে একটা বই বেছে নিলুম। বইটা নতুন—ইংরিজি এবং পেঙ্গুইন সিরিজের। নিশ্চয় ওর বাবার সংগ্রহ নয়। বীরেশ্বর এইসব বই পড়ে? অবাক লাগল। বইটা খুব বিখ্যাত বই—'আরবান গেরিল্লাস।' পাতা ওল্টাতে থাকলুম।…

চার

বীরেশ্বরের মোটর সাইকেলের আওয়াজ যখন কানে এল, তখন রাত বারোটা দশ। এতক্ষণ লম্বা কয়েকটি ঘণ্টা আমার যা কেটেছে, অবর্ণনীয়। কিন্তু পেশাগত অভ্যাসে ধৈর্য বস্তুটা আমার মধ্যে পুরোপুরি থাকায় খুব একটা মাথা খারাপ করে ফেলেনি। নিঃঝুম সুমসাম পাড়াগেঁয়ে রাত, একলা ঘরে থাকা, খাটের নিচে কোথাও ঘুণপোকার উৎকট অবিশ্রাম কট কট শব্দ—যা মনে হচ্ছিল আমার মাথার ভিতরেই রয়েছে, দেয়ালের প্রকাণ্ড সেকেলে বিলিতি ঘড়ির টক টক টক একঘেয়ে আওয়াজ···উঃ, সে এক মারাত্মক অভিজ্ঞতা।

বীরেশ্বর এসে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়িস নি দেখছি! বড্ড দেরী হয়ে গেল, ভাই। এক কাজে গিয়ে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়েছিলুম। ডাক্তার-ফাক্তার তো পেলুমই না, মাঝখানে···থাক্ গে! তোর কোন অসুবিধে হয় নি তো? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ—তোর লোকটা কোন ব্যাপারে ত্রুটি রাখেনি।'

'বোস। আমি আসছি এক্ষুনি।'···বসে সে ভিতরে চলে গেল।

বাইরে ওর লোক মোটর সাইকেলটা কোথায় রাখতে গেল, শুনতে পেলুম। ওদের পার্টির গোপন মিটিং খুব জাঁকালভাবেই হয়েছে, বোঝা যাচ্ছিল। কিছু নিয়ে খুব বিতর্ক হয়েছিল নাকি যে এত দেরী?

মিনিট দশেক পরে বীরেশ্বর একটা ডোরাকাটা পাজামা আর গেঞ্জি পরে ফিরে এল। হাতে জ্বলন্ত সিগ্রেট। মৌরী চিবুচ্ছে সে। মৃদু হেসে বলল, 'দেরী দেখে ভাবছিলি নাকি?'

'একটু ভাবনা হচ্ছিল বই কি।'

'আর বলিস নে! শালা কী পাপে যে রাজনীতি করতে গিয়েছিলুম, এখনও গায়ের গন্ধ গেল না। সরকার এক গাদা

টিকটিকি লাগিয়ে রেখেছে পেছনে। সবসময় শালারা আমার ওপর নজর রেখেছে। জ্বালিয়ে শেষ করে দিলে, মাইরি।'

চোখে তীব্র কৌতূহল এনে বললুম, 'তাই নাকি? আজ এখন কিছু গোলমালে পড়িস নি তো বীরু?'

বীরেশ্বর মিটিমিটি হাসতে লাগল।

'বলছিস না যে?'

'ছেড়ে দে।'...বলে দু তিন মিনিট সে নিঃশব্দে সিগ্রেট টানতে থাকল। তারপর মুখ খুলল।...'তখন তোকে লাইলির কথা বলছিলুম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'...সোৎসাহে লাফিয়ে উঠলুম।...'লাইলি খুব বিখ্যাত মেয়ে হয়ে উঠেছে, বলছিলি। নির্ঘাৎ কোন পলিটিকাল পাটির নেত্রী—না কী?'

বীরেশ্বর সন্তর্পণে যেন চমকাল। এবং ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, 'তুই তো জানিস দেখছি।'

অপ্রস্তুত হয়ে তখুনি বলে উঠলুল, 'না—মানে তোর কথার আঁচে তাই মনে হচ্ছিল। তাছাড়া আর ওর মত মেয়ে খ্যাতি কুড়োবে কিসে?'

বীরেশ্বর কানের লতি চুলকে বলল, 'বিস্তর রাস্তা আছে। ডাকাত দলের সর্দারনী হতেও তো পারে। এর সঙ্গে একটা সিক্রেট পলিটিকাল পার্টি জড়িয়ে দিলেই লাইলি পরিস্কার হল।'

'সে অসম্ভব। অবিশ্বাস্য।'

'কেন? মধ্যপ্রদেশের ভামিনা বাঈ, হিমাচল প্রদেশের আজুরী, হরিয়ানার সিন্ধুমতী—এরা সব কে? কাগজে পড়িস নি এদের কথা? সরকারকে কেমন অতিষ্ঠ করে রেখেছে এখনও।'

'কিন্তু তাই বলে লাইলি। এক পাড়াগেঁয়ে ছাগলচরানী মেয়ে।'

বীরেশ্বর হো হো করে হেসে উঠল।...'ওরা এক সময় সবাই ওই রকম পাড়াগেঁয়ে ছাগলচরানী মেয়েই ছিল। জীবনী খুঁজলে ওসব

ব্যাপারই পাবি আমু। কার মধ্যে কী সম্ভাবনা আছে, কেউ বলতে পারে না। সময় আর পরিস্থিতি, সুযোগ আর তালিম সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব করে দেয়। এই লাইলির কথাই ধর।…'

বীরেশ্বর এবার লাইলির যে কাহিনী শোনাল, তা এই :

আমরা চলে আসার এক বছর পরে লাইলির মা ওর বিয়ে দ্যায় পাশের গাঁয়ের একটা বয়স্ক চাষীর সঙ্গে। লোকটার বউ ছিল আরেকটা। সেই বউটা সতীনকে কিন্তু মোটামুটি ভালইবাসত। স্বামীর সঙ্গে লাইলিকে শুতে দিয়ে নাকি আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকত। এ এক ধরনের যৌনবিকৃতির মনস্তত্ত্ব হতেও পারে। লাইলির বয়স তখনও স্বামীসংসর্গ করার ঠিক উপযুক্ত হয় নি। ফলে লাইলি স্বামীর শয্যাসংক্রান্ত কার্যকলাপ অত্যাচার বলেই ধরে নিত এবং গায়ে হাত দিলেই ভীষণ চ্যাঁচামেচি কান্নাকাটি করত। পালিয়ে আসতে চেষ্টা করত বিছানা থেকে। তখন ওর বয়স্ক সতীন অকুস্থলে হাজির হয়ে আবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত, সে স্বামীকে ভর্ৎসনাও করত। হঠাৎ একরাতে লাইলির সতীন করল কী, সে জোর করে লাইলিকে বিছানায় ধরে রাখল এবং স্বামীকে বলপ্রয়োগে উৎসাহিত করল। ফলে যা অত্যাচার হবার হল। হুঁ, অত্যাচার ছাড়া কী? সদ্যোৎভিন্ন কুঁড়িকে গায়ের জোরে পাপড়ি খুলে বিকশিত ফুলে পরিণত করার চেষ্টাকে বীভৎস অত্যাচার বলাই উচিত। সে রাতে এত জঘন্য ব্যাপার হল যে লাইলি আহত হয়ে যন্ত্রণায় সারারাত কাঁদল, আর বিছানা ভেসে গেল তার 'কুমারী' (বীরেশ্বরের ব্যবহৃত শব্দ) রক্তে।

পরদিন সন্ধ্যায় সুযোগ পেয়ে আহত শরীরে কোন অবিশ্বাস্য শক্তিতে লাইলি প্রায় বুকে হেঁটে পালিয়ে এল স্বামীর বাড়ি থেকে।

কিন্তু ওর মা উল্টে ওকে লাঞ্ছনার একশেষ করল। এ তো গাঁয়ে-গাঁয়ে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার মেয়েদের জীবনে। দশ থেকে বারো-তেরোর মধ্যেই সব মেয়ের বিয়ে হয় চাষী-সমাজে। এ ঘটনা

আকছার ঘটে থাকে। মেয়েদের এটা সয়ে নিতে হয়। সয়ে যায় ক্রমশ। লাইলি কী এমন সৃষ্টিছাড়া যে তার সইবে না? তাছাড়া দারিদ্র্য—সেও একটা ভয়ানক কথা। বুড়ো বয়সে ঘুঁটে কুড়িয়ে নিজের পেটই চলে না। মেয়েকে পুষবে কেমন করে? ফলে লাইলির লাঞ্ছনার সীমা রইল না।

মা তার জামাইকে খবর দিয়ে আনাল। জোর করে আবার সেই রাতেই পাঠিয়ে দিল স্বামীর ঘরে। লাইলির তখন প্রচণ্ড জ্বর।

ক'দিন বাদে অবশ্য বিনি চিকিৎসায় সে সেরে উঠল। সেই হাঁটি হাঁটি পা-পা অবস্থা থেকে যে-মেয়েরা রোদ বৃষ্টি ঝড় শীত গায়ে নিয়ে বড়ো হয়েছে, আরণ্য প্রকৃতির পাঠশালায় যারা জীবন সম্পর্কে পাঠ নিয়েছে, তাদের প্রকৃতি যেন শক্তিও দিয়েছে প্রচুর। সহজে তারা কাবু হয় না। প্রকৃতির এক বীজাণু তাদের রোগ দেয়, অন্য বীজাণু সেই রোগ হরণ করে। 'নেচারকিওর' হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ স্বতঃচিকিৎসাপদ্ধতি প্রকৃতিচর আদিম মানুষের জীবনে। প্রকৃতি-নন্দিনী লাইলি আবার উঠে দাঁড়াল সূর্যমুখীর মত।

একরাতে তখন আবার তার স্বামী তার স্বাভাবিক এবং আইন-সঙ্গত কাম নিয়ে লাইলিকে আকর্ষণ করল। কামান্ধ পুরুষকে নিবৃত্ত করতে হাত ওঠাল লাইলি। পারল না। তখন হঠাৎ সে এক কাণ্ড করে বসল।

সে তৈরী হয়েই ছিল আগে-ভাগে। বালিশের পাশ থেকে একটা ধারালো কাটারি তুলে নিয়ে সে করল কী, এক ধাক্কায় পায়ের নিচে চিৎপাত স্বামীর যৌনাঙ্গটি কেটে ফেলল।...

বাবুগঞ্জ থানায় হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হয়েছিল সে রাতে এক গ্রাম্য কিশোরী।...'আমি খুন করেছি দারোগাবাবু, আমার স্বামীকে খুন করে ফেলেছি।'

এই খুনের মামলায় ওর মায়ের ভিটেটুকুও বিকিয়ে গেল। মেয়েকে বাঁচাতে চেয়েছিল মা। সেসন জজ কিন্তু জুরীদের রায়

মেনে নিলেন না। লাইলি বেঁচে গেল আইনগত কী জটিলতায়। আর ফরিয়াদী পক্ষও গরীব। হাইকোর্ট অবধি যাবার সাধ্য ছিল না—উৎসাহও হয়তো ছিল না।

দীর্ঘ তেরো মাস বিচারাধীন হাজতবাস করে যে লাইলি ফিরে এল, সে তখন অন্য মেয়ে। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ায় আর ছায়ায় থাকার ফলে তার স্বাস্থ্যসৌন্দর্য অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। মা আবার তার বিয়ের যোগাড় করতে ব্যস্ত হল। তখন এই রাস্তাটা হাইওয়ে হয়েছে সবে। কিছুদূর অন্তর-অন্তর একদল করে রোডকুলি নিয়মিত রাস্তা দেখা-শোনা করছে। তাদের দলেই ছিল একটি যুবক। খুব শৌখিন প্রকৃতির মানুষ সে। পৈতৃক মাত্র কয়েক কাঠা চাষের জমি অবশিষ্ট ছিল তার। রোডকুলির চাকরী পাবার পরই সে জমিটা বেচে কিনে ফেলল একটা সাইকেল আর একটা ট্রানজিস্টার। প্রতি ভোরে সে সাইকেলের পিছনে কোদাল ঝুড়ি আর সামনে ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে মহানন্দে রাস্তায় কাজ করতে যায়।

স্বামীহন্ত্রী লাইলিকে কেউ বিয়ে করতে চাইছিল না—এই যুবকটি কিন্তু রাজী হয়ে গেল। এখন লাইলি রাজী হলেই হয়ে যায়। তার মা এবার মেয়ের অমতে বিয়ে দিতেও ইতস্তত করছিল। ওকে আর তো বিশ্বাস করা যায় না!

আশ্চর্য, লাইলি রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিয়ে হল। এবং এরপর যা দৃশ্য দেখা গেল, তা এই পাড়াগেঁয়ে জীবনে অভিনব, বিস্ময়কর।

রাতের অবসরে নতুন স্বামী কামাল হোসেন বাঁজাডাঙায় লাইলিকে সাইকেল চাপানো শেখায়। কিছুদিন পরে দেখা গেল লাইলি সালোয়ার-কামিজ পরে চুলে বেণী বেঁধে রাণীহাট মাইনর গার্লস স্কুলে পড়তে যাচ্ছে—সাইকেল চেপেই যাচ্ছে। ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের মেয়েটি—রীতিমত বউ যে!

ক্লাস সিক্সে ভালভাবে পাস করল লাইলি। ততদিনে

বীরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেছে। প্রতিদিন হাইওয়েতে সাইকেল চেপে আসা মেয়েটি সম্পর্কে কৌতূহল হয়েছিল বীরেশ্বরের। লাইলির রূপ তখন ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদের মতন স্নিগ্ধ আর সোনালি জ্যোৎস্নায় অনুপম। একদিন হল কী, স্কুল থেকে ফেরার পথে হাইস্কুলের কিছু ছাত্র লাইলিকে অশ্লীল কথা বলে বসে। লাইলি তক্ষুণি সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল গাছে ঠেস দিয়ে রাখে এবং তাদের একজনকে চড় মারে। জামা ছিঁড়ে ছায়। অন্যেরা তখন তাকে ঘিরে ফেলে। ব্যাপারটা কদ্দুর গড়াত কে জানে, বীরেশ্বর এসে পড়ে হঠাৎ। বীরেশ্বরকে দেখামাত্র ছেলেগুলো দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এভাবেই পরস্পর পরিচয় হয় ওদের। সেদিন শিমুলিয়া অবধি বীরেশ্বর লাইলির সঙ্গে গেল—পৌঁছে দিয়ে এল। পড়ন্ত বিকেলে এক দুর্ধর্ষ বিশালদেহী সুন্দর যুবক, তার পাশে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে কথা বলতে বলতে নির্জন হাইওয়েতে হেঁটে যাচ্ছে এক রূপসী সদ্যযৌবনা ছাত্রী—এই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসে।

বাবুগঞ্জে মেয়েদের হাইস্কুল আছে। কামাল হোসেন বাহান্ন টাকা মাইনে পায়। সে রাজী ছিল ওকে পড়াতে। হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

এক দুপুরে একজন মাতাল লরী-ড্রাইভার রাস্তার ধারে বিশ্রামরত রোডকুলিদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। ব্রেক ফেল করেছিল নাকি। কামাল হোসেন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। অন্যান্যেরা সাংঘাতিক আহত হয়ে পরে তিনজন মারা গেল—বাকি দুজন পঙ্গু হয়ে বাঁচল।

দু চোখে অন্ধকার দেখল লাইলি। তখন তার মা-ও বেঁচে নেই। বীরেশ্বর তাকে চাকরী করার পরামর্শ দিল। মাইনর পাস, তাছাড়া মুসলিম অনগ্রসর সমাজের মেয়ে, চাকরী পাবার সম্ভাবনা লাইলির প্রচুর।

তখন গ্রামে-গ্রামে পাঠশালার পরিকল্পনা চলেছে সরকারের।

কথা হল, শিমুলিয়ায় প্রাইমারি স্কুল হবে। লাইলি আপাতত বিনা বেতনে সেখানে পাঠশালাটা চালু করুক। লোকেরাও রাজী। জায়গা পাওয়া গেল স্কুলের। ক্লাস শুরু হল। লাইলি একা পড়ায়। স্কুল মঞ্জুরী হলেই তার চাকরীও হয়ে যাবে।

এমন সময় ঘটল দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। বীরেশ্বর হঠাৎ রাগের মাথায় একটা লোককে খুন করে বসল। বীরেশ্বরকে পুলিস অ্যারেস্ট করল। তার সারা গায়ে রক্ত। তাকে বাবুগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হবে—বাসের অপেক্ষায় পুলিস রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় লাইলি উদ্‌ভ্রান্তের মত সেখানে গিয়ে হাজির। সাইকেল থেকে নেমে সবার সামনেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বীরেশ্বরের বুকে। রক্তে সে-ও লাল হয়ে গেল। এ এক আশ্চর্য দৃশ্য।

কেউ জানত না এতদিন গোপনে কী ঘটছিল, আজ হঠাৎ তা প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হল। লাইলি যে এত 'প্যাসোনেট মেয়ে' (বীরেশ্বরের ভাষায়) তাও জানা ছিল না কারো। সে ফুলে ফুলে কাঁদে—'কেন, কেন তুমি এমন করলে! আমার যে কত সাধ ছিল!…'

কী সাধ ছিল গোপনে রাখা—দুর্ভাগ্য কামালের, সে-ও জানত না। সে বেঁচে থাকলে এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে ঘৃণায় দুঃখে আত্মহত্যা করে বসত নির্ঘাৎ। এত বেইমান মেয়ে লাইলি!

চাষী মুসলিম মেয়ে। সৌন্দর্যবতী। মোটামুটি শিক্ষিতা। তার প্রতি লোকের একটা মোহ জন্মেছিল ক্রমশ। সেটা ভেঙে ঘৃণা জন্মাল। শিমুলিয়ার মুসলমান সমাজ ফেটে পড়ল ক্রোধে। ওকে একঘরে করল। ওর নামে দরখাস্ত গেল স্কুলবোর্ডে। স্কুলে অন্য মাস্টারের ব্যবস্থা করা হল। শুধু তাই নয় হিন্দু যুবককে ভালবাসার অপরাধে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তার ঘর জ্বালিয়ে দিল। তারপর তার চুল কেটে গলায় জুতোর মালা ঝুলিয়ে গাঁয়ের বাইরে রেখে এল। তারপর আর তাকে কেউ দ্যাখে নি।…

বীরেশ্বর তখন হাজতে। সে শুনল সব। কিন্তু জামিন পেল না। তারপর তার ফাঁসির বদলে বয়স বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। বীরেশ্বরের বাবা এক সময়ের জমিদার—প্রভাবশালী লোক। মামলা তুললেন হাইকোর্টে। এবার বীরেশ্বরের ওপর ফৌজদারী তিনশো দুধারা চার্জ সরে একশো চল্লিশ ধারা। মেয়াদ কমে দাঁড়াল এক বছরে।

বীরেশ্বরের বাবা এরপর মারা যান। হঠাৎ একদা বীরেশ্বর জেল থেকে পালিয়ে এল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—শুধু লাইলি—লাইলিকে সে দেখতে চেয়েছিল। কেন লাইলি তার সঙ্গে একবারটিও দেখা করল না আর, জানবার তীব্র কৌতূহল হয়েছিল তার।

তখন কোথায় লাইলি? কেউ তার খোঁজ দিতে পারল না। বীরেশ্বর হন্যে হল খুঁজে। লাইলি আশ্চর্যভাবে উবে গেছে যেন। তখন সে নিজেই ধরা দিল পুলিসের হাতে। জেল পালানোর ফলে তার মেয়াদ চারগুণ বেড়ে গেল এবার।...

জেল থেকে একদিন ফিরে এল বীরেশ্বর। লাইলিকে ভুলে গেল, কিংবা ভুলতে চেষ্টা করার ফলেই ভুলেই গিয়েছিল ইতিমধ্যে। দেশে এসে এবার সে পূর্ণোদ্যমে বামপন্থী রাজনীতি করতে ব্যস্ত হল। জেলে থাকতেই এ ব্যাপারে দীক্ষা হয়ে গিয়েছিল তার। কয়েক বছরেই সে এই এলাকার একজন গণ্যমান্য নেতা হয়ে উঠল।

সেই সময় এক আশ্চর্য ঘটনাচক্রে কলকাতায় তার সঙ্গে লাইলির দেখা হয়ে যায়। রাস্তায় পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। বীরেশ্বর বলে ওঠে, 'লাইলি না?'

লাইলি বলে ওঠে, 'বীরুদা!'

এন্টালি এলাকার এক বস্তীতে নাকি লাইলি থাকে—তার এক দূর-সম্পর্কের দাদা হানিফ আলির সঙ্গে। ক্রমশ বীরেশ্বর টের পেল, লাইলির বর্তমান পরিচয় কী এবং হানিফই বা কে?

যেদিন অপমানিতা লাঞ্ছিতা লাইলি মূর্ছাহতের মত হাইওয়েতে হেঁটে যাচ্ছিল, কোথায় যাবে জানত না—তাকে পথ থেকে তুলে নিল ইসমাইল নামে এক বাস-ড্রাইভার। ইসমাইল কামালের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। সেই সুবাদে পরিচয় ছিল ওদের। ওই অদ্ভুত বিকৃত চেহারায় লাইলিকে পাগলের মত পথে যেতে দেখে সে বাস থামিয়ে তার কাছে যায়। ভেবেছিল, হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে কামালের বউটা। গলায় জুতোর মালা, মাথা খাপ-ছাড়াভাবে কামানো, গা-ময় পাঁক। লাইলি মূর্ছিত হয়ে পড়ে তক্ষুনি।

বহরমপুরে ইসমাইলের বাড়ি। তার ছোটভাইয়ের নামই হানিফ। হানিফ কলকাতায় কুখ্যাত গুণ্ডা ছিল একদা। তাকে ষোল বছরের জন্যে নির্বাসিত করা হয়েছিল কলকাতা থেকে। বহরমপুরে গিয়ে দাদার বাড়ি বাস করছিল। বিয়ে করেনি। ষোল বছর ধরে ফুটপাতে যন্ত্রপাতির সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পার্টস বিক্রি করা তখন তার পেশা। গুণ্ডামি একটু-আধটু করে—কিন্তু খুব সাবধানে। এবং পুলিসকে হাতে রেখেই করে। লাইলি যখন গেল, তখন হানিফের বয়স প্রায় ষাট—কিন্তু শক্তসমর্থ যুবকের মতই সে যে-কোন কাজ করতে পারে। ইসমাইল তার দু-বছরের বড়—ইসমাইলও ছোটভাইয়ের মত সমর্থ মানুষ। কিন্তু সচ্চরিত্র। ছোটভাইকে সে ধর্মোপদেশ দেয় দুবেলা। গাল-মন্দও করে। হানিফের ছোঁকছোঁকানি তার দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হানিফকে ভালবাসেও খুব। তাই তাড়াতে পারে না আশ্রয় থেকে।

লাইলি হানিফের ফুটপাথের দোকানে গিয়ে বসে থাকতে লাগল তারপর। হানিফ এই মেয়েটির সব শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল তার প্রতি। আর লাইলিও এই বুড়ো গুণ্ডার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করত। তার অন্ধকার জীবনের কাহিনী শুনতে ভালবাসত। বুড়ো চাপাগলায় সব কুকর্মের কথা বলে যেত নির্দ্বিধায়। এতদিন যেন সে তার জীবনের যাবতীয় কীর্তি-কাহিনী

বলে নিজেকে হাল্কা করার লোক খুঁজছিল, পেয়ে গেছে। সে যেন বলতে চায়, এই ছাখ—জীবনকে কী চোখে আমি দেখেছি, জীবন আমাকে কী দিয়েছে, আর আমিই বা কী দিয়েছি তাকে।

আস্তে আস্তে পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করে নিচ্ছিল যেন। লাইলি ক্রমশ টের পেল, হানিফ এখনও লাইনে আছে। অনেক রাতে তার কাছে লোকেরা আসে। ফিস ফিস করে কথা বলে যায়। হানিফও চুপি চুপি বেরিয়ে যায়। লাইলি সব জানতে পারে। একদিন চুপি চুপি সে হানিফকে অনুসরণ করল। সেদিনই আবিষ্কার করল গঙ্গার ওপারে যে বিজলী তারের লাইন গেছে, হানিফের লোকেরা সেই তার কাটছে। লাইলি সোজা গিয়ে হাজির হল হানিফের সামনে। হানিফ অস্ফুট চিৎকার করল; কিন্তু লাইলি হাসল শুধু।

সেই শুরু। তারপর লাইলি কাজে লাগে ওদের। সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। রাহাজানি ছিনতাই খুন-খারাবি—যত রকমের অপরাধ থাকে, বেড়ে যেতে থাকল বহরমপুরে। পুলিস টের পেল, একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েও আছে এ দলে।

ইতিমধ্যে হানিফের নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। সে লাইলিকে নিয়ে কলকাতা পালাল। লাইলি তার মেয়ে, লাইলা তার মা।

কলকাতায় লাইলি নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করল। সে নির্দ্বিধায় পিস্তল ছুঁড়ে মানুষ খুন করতে পারে তখন—একটুও হাত কাঁপে না। তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ততদিনে। এক কামান্ধ পুলিস অফিসারকে ও নিষ্ঠুর হাতে ভোজালিতে কুপিয়ে কেটেছে। বলা বাহুল্য, এটা নকশালদের নামে চালানো সম্ভব হয়েছিল।...

বীরেশ্বরকে দেখে লাইলি আবার অস্থির হয়ে উঠেছিল। কথা বলতে হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। 'বীরুদা, আমার আর একটুও ভাল্লাগে না এসব। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চল। এখানে থেকে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর পারছি না বীরুদা!'

বীরেশ্বরের মাথায় এক মতলব খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে কলকাতা গিয়েছিল বিশেষ একটা ব্যাপারে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে সম্প্রতি। সে আরও সরাসরি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী অর্থাৎ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে তার বিশ্বাস নেই। সে চায় প্রত্যক্ষ বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু নকশালপন্থীদের সঙ্গেও তার মতের মিল নেই। সে-ও সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থায় বিশ্বাসী। কিন্তু 'অ্যাকশন' সম্পর্কে তার মতামত ভিন্ন। সে কিছু জোতদার বা পুলিস কিংবা ওই ধরনের খুন-খারাবি করে প্রাথমিক পর্যায়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির পথে বিশ্বাসী নয়। তার মত হল, আগে প্রচুর অস্ত্র চাই—সে জন্য চাই প্রচুর টাকাকড়ি। এসবের সঙ্গে সংগঠনের কাজও চলবে। সে বলে, নতুন ক্যাডারকে মানুষ মারতে শেখানোর চেয়ে যে ইতিমধ্যে মানুষ মারায় অভ্যস্ত এবং পাকা—সে-ই আমাদের কাজের প্রকৃত উপযোগী। নতুন ক্যাডারকে দিয়ে যে-কোন 'অ্যাকশনে' ঝুঁকি অনেক—কিন্তু ওইসব ধরনের কাজে যাদের পেশাগত দক্ষতা আছে—তাদের দিয়ে নির্ভুল ফলাফল পাওয়া সোজা। আপাতত যখন বিপ্লব আরম্ভ করছিনে—এ তো সবে প্রস্তুতির অঙ্গ—তখন আদর্শের বা আদর্শবাদী ক্যাডারের প্রশ্নই ওঠে না। ওসব আসে, যখন সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্র ভাঙতে যাচ্ছি—তখন।...

এই মতামতের সপক্ষে একটা গোপন দল সবে গড়া হয়েছে। বীরেশ্বর গিয়েছিল, তাদেরই এক বৈঠকে। খুব উদ্দীপ্ত হয়েই এবার বাড়ি ফিরছিল সে। পথে লাইলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে।

হানিফ ঘরে ছিল না। লাইলি বীরেশ্বরের সঙ্গে চলে এল। রাতের ট্রেনে ফিরে এল ওরা। রাণীহাট পৌঁছল সকালে। লাইলিকে তখন এ এলাকায় আর কারো চেনার সাধ্য নেই। সবাই ভাবল, বীরেশ্বরের কলকাতার মাসতুতো বোন-টোন হবে।

বীরেশ্বরের বাড়িতে থাকবার মধ্যে শুধু এক রুগ্না পিসি।

লাইলি ওখানেই থাকে। বোন পরিচয়েই থাকে—বাইরে একবারও বেরোয় না।

হ্যাঁ, গান্ধর্ব বিবাহ একটা হয়ে গেল বইকি লাইলির সঙ্গে বীরেশ্বরের। রাতে ওরা স্বামী-স্ত্রীর মত এক শয্যায় শুয়ে থাকে। দিনের পরিচয়, ওই বোন।

কিন্তু লাইলির রক্তে তখনো বিষ ফুরিয়ে যায় নি। মুছে যায় নি অন্ধকারের রোমাঞ্চকর স্বাদ। বীরেশ্বর সাবধানে তা কাজে লাগাচ্ছিল। আস্তে আস্তে লাইলি আবার 'এ্যাকশনে' ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। এ না হলে জীবনটা যে আটপৌরে একঘেয়ে হয়ে ওঠে তার। বীরেশ্বর তাকে বিপ্লবের তত্ত্ব আর রাজনীতিতে দীক্ষা দিল। লাইলি একদা নেত্রী হয়ে উঠল দলের।

পুলিসের টনক নড়লে তখন লাইলি বীরেশ্বরের বাড়ি ছাড়ল। ওর থাকার কোন নির্দিষ্ট জায়গা রইল না। সে আজ এখানে কোন চাষীর বাড়ি, কাল সেখানে থেকে দশ মাইল দূরে অন্য কোথাও, পরদিন আবার অন্যখানে। আর ছদ্মবেশ ধারণে তার জুড়ি নেই। দিব্যি জেলের মেয়ে সেজে এক-কোমর জলে জাল পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও মজুরনী সেজে ক্ষেতে ধান পোঁতে। কখনও দরকার হলে চুড়িওলির বেশে মাথায় চুড়ির ডালা নিয়ে গাঁয়ের পথে চুড়ি বেচতে যায়। গেরস্থবউয়ের সঙ্গে এই এলাকার দেহাতী ডায়ালেক্‌টে কথাবার্তা চালিয়ে যায়। 'এগুলান ছাখো না বহিন, পসন্দ হয় না তুমার?' একবার পুলিস একটা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। লাইলি দিব্যি কুনাইপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে কাঁখে কাঠ কুড়নো ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল বিলের দিকে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, উরুলি-ঝুরুলি আ-তেলা চুল, নাকে নাকছাবি, ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, গলা আর ঘাড়ের মাংসে একগাদা ঘামাচি। 'অ শৈল, অ এলোকেশী! ঘামাচিগুলোন কুট কুট করছে লো। গেলে দে না ভাই!' পুলিস কনস্টেবলগুলো হাসে। কুনাইবউটি বলে, আ মর! হেসে যে খুন

বলি, ও মিনসে, সাধ্যি থাকে তো দাও না পটাপট গেলে। কিন্তুক আমাদের মিনসে আবার বড্ড একরোখা। বউয়ের গায়ে হাত দিতে দেখলে গবরমেণ্টোকেও গেরাহ্যি করে না!—হু!...আরেকবার কোথায় পুলিস গ্রাম ঘিরেছে। একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন লেডি ডাক্তার—হাতে স্টেথিসকোপ। ঝকঝকে ভব্য নাগরিকা, সুশিক্ষিতা স্মার্ট মেয়ে। পিছনে একটা লোক—ব্যাগ বয়ে আনছে। ...পুলিস অফিসার এগিয়ে বললেন, 'শুনুন।'...'বলুন।' বলে দাঁড়ালেন লেডি ডাক্তারটি।...'আপনি কোত্থেকে আসছেন?...ব্যাগ থেকে একটা সুদৃশ্য কার্ড বের করলেন লেডি ডাক্তার। মিস আর নন্দী এম. বি বি. এস. ইত্যাদি ইত্যাদি। সাঁইথিয়ার ঠিকানা। ব্যাগে যথারীতি ডাক্তারী সরঞ্জাম। সঙ্গের লোকটা বলল, 'মায়ের ভীষণ ব্যামো দারোগাবাবু। বহরমপুরে একবছর দেখিয়ে সর্বস্বান্ত হলাম। আমার মামা সাঁইথের লোক। বললে ওখানে একজন ভাল লেডি ডাক্তার আছেন...,

লেডি ডাক্তার মিস নন্দী ভ্রু কুঁচকে ঠোঁটে বাঁকা হেসে বিশুদ্ধ মার্জিত উচ্চারণে ইংরিজিতে বললেন—'এনিথিং মোর ইউ লাইক টু স্যাটিসফাই ইওরসেলফ অফিসার?'

'নো। থ্যাঙ্কস। প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড, মিস ডক্টর, দিস ইজ সিম্পলি আওয়ার রুটিন জব।'

হ্যাঁ—লাইলি তো অর্ধ-শিক্ষিতা মুসলিম চাষীর মেয়ে। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলেই বা কী? অমন উচ্চারণে বিশুদ্ধ ইংরিজি বলবে, অমন সুভব্য চেহারা হবে? অসম্ভব। আসলে ক্রিমিনাল সে। সে তার চেহারা বাচনভঙ্গীতে অভিজ্ঞ ধুরন্ধর পুলিস অফিসারটির চোখে ধরা পড়তে বাধ্য।

পুলিসের এই প্রবল আত্মবিশ্বাসই লাইলির আত্মরক্ষার যত শক্তি হয়ে উঠেছে।...

* * *

দেয়ালঘড়িতে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজল। বীরেশ্বর এবার থেমে সিগ্রেট ধরাল। আমি কোন প্রশ্ন করিনি এতক্ষণ। নিঃশব্দে শুনে গেছি। এবার হাই তুলে আড়ামোড়া দিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ—লাইলির কাহিনী সত্যি বড় অদ্ভুত। এখনও আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না রে। ভাবা যায় না!'

বীরেশ্বর হাসল না। গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাকে। গলা ঝেড়ে বলল 'একটা কথা আনু। তুই আমার বাল্যবন্ধু। ঝোঁকের বশে তোকে এমন অনেক কিছু বলে ফেললুম, যা আমার বলা আদৌ উচিত ছিল না। পার্টির শৃঙ্খলাগত প্রশ্ন আছে। কিন্তু তবু সামলাতে পারলুম না—বলতে ইচ্ছে করল। আসলে কী হয়েছে জানিস, আজকাল আমার মধ্যে কেমন একটা ক্লান্তি এসে গেছে। মনে হচ্ছে, হয়তো রাজনৈতিক আদর্শের ছলে কে আমাকে বা আমাদের সবাইকে ব্যক্তিগত স্বার্থে এক্সপ্লয়েট করছে। দিনে দিনে কাজে আর উৎসাহ পাচ্ছি না। আমি শুধু একটা কথা ভাবছি। কিউবা বা অন্যত্র যা ঘটেছে, তা সেখানেই সম্ভব হয়েছে। কারণ, সে জায়গা ছোট্ট। আর ভারতবর্ষ একটা বিশাল দেশ। 'বিশাল' শব্দটা কথার কথা নয়—প্রকৃত অর্থেই বিশাল। এর অর্থনীতি কিছু ঔপনিবেশিক কিছু সামন্ততান্ত্রিক আবার কিছু ধনতান্ত্রিক। ভীষণ কণ্ট্রাডিকশন আছে—কিন্তু আসলে রাষ্ট্রযন্ত্রটি আধুনিক—ভীষণ সফিস্টিকেটেড। তাছাড়া ভারতের অধিবাসীদের রক্তে কী যেন সৃষ্টিছাড়া একটা ব্যাপার আছে। এরা ঝোঁকের মাথায় হিংস্র হতে পারে। হিংসায় যা খুশি করতে পারে—কিন্তু পরক্ষণে ব্যক্তিগত ভাবে নয়, যৌথ ও সমাজগত ভাবে ভীষণ অনুতপ্ত হয়। কল্পনা করতে পারিস, কোটি কোটি লোক এখনও প্রতিবছর গঙ্গা-জলে পিতৃতর্পণ করে! এটা ভাববার ব্যাপার। আমাদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বাইরে-বাইরে অন্য রং বা হাওয়া লেগে যতই বদলাক, মূলে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে আদৌ বদলায়

নি। শান্তি আমাদের গোষ্ঠীতে সামাজিক অবচেতনার প্রাথিত একান্ত ধন। আমরা ব্যক্তিগত বিচারে এক মুখে অশান্তির জয়ধ্বনি দিই, আরেক মুখে সমাজগত সংস্কারে বিড় বিড় করে বলি, ওঁ শান্তি। আমরা বদলাতে চাইনে। সব বদলকে আমরা বাইরে-বাইরে মেনে নিলেও ভিতরে থেকে যাই গোঁড়া অপরিবর্তনীয়।... যাক্ গে। এসব তত্ত্বকথা বলে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস হচ্ছে ক্রমশ—ভারতবর্ষে এভাবে কিছু করা অসম্ভব—যেভাবে আমরা করতে যাচ্ছি। তাছাড়া সব দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার যারা মূল জিম্মাদার, সেই সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ বিপ্লবের সময় কাঁধে কাঁধ লাগায়। এদের বাদ দিয়ে কোথাও বিপ্লব ফলপ্রদ হয়নি—হতেও পারে না। আমাদের দেশে প্রদেশ, বর্ণ, আঞ্চলিকতা, নানান মানসিক গঠন ইত্যাদির এত সংস্কারগত জটিলতা রয়েছে—যা সেনাবাহিনীর মধ্যেও প্রকট। সে কারণেই তো চরম বিশৃঙ্খলার সময়েও এদেশে সামরিক শাসন হল না—হতে পারবেও না। আমাদের মিলিটারির উদ্ভব প্যাট্রিয়টিজম বা ন্যাশানালিজম থেকে হয় নি, হয়েছে ব্রিটিশসূত্রে। সেই সংস্কার সহজে হারাবে না—হারায় নি। এরা নিয়মনিষ্ঠ বীর, দেশরক্ষায় জীবন দিতে পারে—কিন্তু এদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ জন্মানোর সুযোগ হয় নি বা নেই। এরা রাষ্ট্রের অসচেতন যন্ত্র মাত্র। এদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা সম্ভব তাদেরই, যারা কোন ভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। আমার ধারণা, ওই কারণেই আমাদের সেনাবাহিনী একদা পৃথিবীতে অজেয় আর দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে। যাই হোক, আমার পার্টি যা করতে যাচ্ছে, তা নিছক কাকতাড়ুয়া লেলিয়ে দেবার হাস্যকর চেষ্টা বলেই মনে হচ্ছে...'

বীরেশ্বর থামল।...

আমি বলে উঠলুম, 'বীরু, আজ কোথায় গিয়েছিলি বলতে আপত্তি আছে?'

বীরেশ্বর মাথা দোলাল।…'নাঃ বলেই তো ফেলেছি সব। আজ আমাদের এক মিটিং ছিল আঞ্চলিক কমিটির।'

'খুব তর্কাতর্কি করে এলি নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ!'

'বীরু, এতে তোর ক্ষতি হতে পারে তো?'

পারে বই কি। আমাদের পার্টির শৃঙ্খলা সাংঘাতিক।'…বীরেশ্বর অন্যমনস্কজবাব দিল।…'অবশ্য এখনও চরম কিছু করে ফেলি নি। আমার মতন প্রশ্ন তো আরও অনেকের মধ্যে আছে। নেতাদের মতে এটা নাকি থাকা ভাল—দল যে জ্যান্ত মানুষের তা বোঝা যায় এবং দলের গতিশীলতারও লক্ষণ।'

একটু সাবধান হয়ে বললুম, 'লাইলির কী মত? তোর পক্ষে নিশ্চয়?'

বীরেশ্বর একটু হাসল।…'প্রশ্নটা আসলে প্রথম কিন্তু লাইলিই তুলেছিল, তা জানিস? কী জানি কেন, ওর আগাগোড়া সন্দেহ, কোন সুচতুর ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ব্যক্তিগত স্বার্থে আমাদের কাজে লাগাচ্ছে। আমি ওকে আমল দিচ্ছিলুম না। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম ও বিচিত্র ধরনের ক্রিমিনালদের সঙ্গে মিশেছে—অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমাজপতি বা প্রখ্যাত কীর্তিমান ব্যক্তিও তাদের রিং-লীডার বা আশ্রয়দাতা, তাও দেখেছে। লাইলি ঝানু মেয়ে। কত কৌশলে সুশিক্ষিত সুচতুর বুদ্ধিমান মানুষ পয়সা কামিয়ে বড়লোক হতে চায় লাইলি তো কম ভাখে নি। তাই তার সিক্সথ সেন্সের প্রতি আমারও বিশ্বাস বদ্ধমূল হল। যে পদ্ধতিতে ডাকাতির মাল আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় কোষাগারে পাঠাই, তাতে আপাতত কিছু বোঝার উপায় নেই যে শেষ অবধি তার কী হিল্লে হল। অস্ত্র কেনার কথা। অস্ত্র যা লাগে, তা অবশ্য পাই। কিন্তু বিপ্লবের জন্যে যে অস্ত্রশক্তি দরকার, তার কদ্দূর কী হল—সে হিসেব কেন্দ্র ছাড়া কোন জানবার উপায় নেই।'

আবার সতর্কভাবে প্রশ্ন করলুম, 'আচ্ছা বীরু, তোদের কেন্দ্রীয় অফিস তো কলকাতায় ?'

বীরেশ্বর হাসতে লাগল।...'উহুঁ, অতটা না শুনলেও তোর চলবে।'

'এমনি জানতে চাচ্ছি—কৌতূহল, বীরু।' মুখে-চোখে তীব্র কৌতূহল আর উদ্বেগ ফুটিয়ে বললুম।...'তোদের উঁচু তলার নেতাদের এখনও পুলিস ধরছে না কেন ?'

'পেলে তো ধরবে। অনেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গেছে। অনেকে এই বীরেশ্বরের মত গায়ে কোন গন্ধের গ'ও রাখে নি যে পুলিস কায়দায় ফেলবে। দলের অপারেশন তো সারা ভারতবর্ষ জুড়ে।'

ভাবলুম, এই নামগুলো আমার জানার দরকার ছিল খুবই। কিন্তু বীরেশ্বর তা বলবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে থাকলুম চুপচাপ। এবার শুধু লাইলি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করার কথা ভাবছিলুম।

তার আগেই বীরেশ্বর নিজে থেকে বলে উঠল, 'লাইলিকে তোর কথা বললুম।'

'বললি নাকি ?'...উৎসাহিত হয়ে উঠলুম।...'কোথায় ? মিটিংয়ে নিশ্চয় দেখা হল ?'

বীরেশ্বর মিথ্যে বলছে, আজ দুপুরে যা শোনার শুনেছি—তবু আমাকেও ওর সঙ্গে এবার সমানে অভিনয় করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বীরেশ্বর আমার কথার জবাবে বলল, 'হ্যাঁ—মিটিংয়ে এসেছিল। তোর কথা শুনে খুব খুশি হল। তোর কথা ওর মনে ছিল।'... বীরেশ্বর একটু হেসে চাপা গলায় সকৌতুকে আবার বলল, 'শালা আমু। তুমিও কম যাও না। ওকে কবে নাকি চেপে ধরে চুমু খেয়েছিলি রে ?'

হেসে উঠলুম।...'ও বলছিল নাকি ? যাঃ, স্রেফ গুল !'

'হুঁ, গুল বই কি! লাইলি এ নিয়ে গুল মারতে যাবে কোন দুঃখে? তা হ্যাঁরে আনু, বেশি কিছু করিস নি তো? ছাখ, ও আমার রীতিমত স্ত্রী এখন। বেশি কিছু করে থাকলে বল। গঙ্গাজল ছড়িয়ে শুদ্ধ করে নেব।'...হা হা করে হেসে উঠল সে।

মনে মনে বললুম, তোমার কাছে গঙ্গাজলের মহিমা! অপরাধীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ঘুরেছি,—বিস্তর প্রেম দেখেছি, কিন্তু লাইলি-বীরেশ্বরের মত কোথাও দেখিনি। এ সব হিসেবের বাইরে।

প্রকাশ্যে বললুম, 'বীরু, লাইলিকে তুই স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিস —এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে ভাই। তুই তো দেখেছিস, আমি ধর্মবিশ্বাসী ছিলুম না অতটুকু বয়সেই, এখন তো নয়ই। এ তোর দারুণ উদারতা শুধু নয়, মানবতা আর দুঃসাহসিকতাও বটে। তুই-ই এটা পারিস। কিন্তু কেন বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে আছিস দুজনে? কেটে বেরিয়ে আয়। স্বাভাবিকভাবে ঘর-সংসার কর। ছেলেপুলে হোক। আমরা শুনে খুশি হই।...'

বীরেশ্বর হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। কী যেন ভাবল। তারপর মাথা দোলাল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'আমাদের দুজনের রক্তে কী আছে রে ভাই। ওসব আমাদের বরাতে নেই। তাছাড়া লাইলির নামে অজস্র খুন আর ডাকাতির মামলা ঝুলছে। সরকার ওকে ঘরের সুখ আপাতত দিচ্ছে না। লাইলি সব ছেড়ে-ছুড়ে গৃহলক্ষ্মী হয়ে উঠলেও নয়। আইন তো ছেড়ে দেবে না ওকে।'

বললুম, 'হ্যাঁ—সেও কথা। তবে বীরু, এক কাজ করলে তো পারিস। যদি ধর, তোরা দুজনে এদেশের বাইরে কোথাও পালিয়ে যাস?'

বীরেশ্বর তাকাল।...'কোথায়, শুনি?'

আমার মাথায় যা এল বলে দিলুম।...'ক্যানাডা চলে যা দুজনে। আমার জানা শোনা কিছু ছেলে সম্প্রতি চলে গেল। ভাল কামাচ্ছে।

ওরা লিখেছে, বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাবে। তুই যদি যাস, তাহলে আমি কিন্তু ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার লোক আছে। কোন অসুবিধে হবে না।'

এই কথাগুলো কিন্তু আমি বীরেশ্বরকে মন থেকেই বললুম। ওরা যদি সত্যি বাইরে চলে যায়, অন্তত আমি বেঁচে যাব ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওদের ক্ষতি করতে। ক্যানাডা যাবার ব্যবস্থাটা আমার করে দেওয়ার স্কোপও রয়েছে।

বীরেশ্বর কিন্তু হেসে বলল, 'তুই পাগল হয়েছিস আনু? এই রাণীহাট থেকে চলে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব না? আজ অবধি এখানের মাটি ছেড়ে একবিন্দু নড়িনি—নড়তে পারবও না!'

'কিন্তু লাইলি তোর স্ত্রী। কতদিন ও বেচারা অমন করে লুকিয়ে থাকবে—সরি, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকবে। তারও তো নিশ্চয় তোর মত ঘরকন্না করার একটা স্বাভাবিক সাধ-আহ্লাদ আছে!'

'হুঁ—আছে হয়তো।'...বীরেশ্বর আনমনে বলল।...'কিন্তু... ছেড়ে দে ওকথা। রাত হল একটা কথা বলি শোন, আনু। লাইলি তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল আমার। বললুম, 'তাই বুঝি?'

'তোর ওকে দেখতে ইচ্ছে করে না, আনু?'...বীরেশ্বর মিটিমিটি হাসল।

'করে না আবার? ভীষণ ইচ্ছে করে রে। অতসব শোনার পর...'

'কিন্তু আনু, তুই দেখেছিস ওকে।'

ভাব গোপন করে চমকে ওঠার ভাণ করলুম।—'আমি দেখেছি? কখন?'

'হুঁউ। দেখেছিস। কথা বলেছিস।'

'সেকী! যাঃ—অসম্ভব।'

'উঁহু—আজ সকালে বাস-রাস্তায় দেখেছিস। লাইলি তোকে

প্রদীপের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল। তুই নাকি আমার কথা মত আগেই ওকে প্রদীপের স্ত্রী ঠাউরেছিলি।'

'আশ্চর্য, আশ্চর্য! বীরু, কী বলছিস রে! সেই মহিলাই লাইলি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আশ্চর্য বীরু, আমি যে একটুও চিনতে পারিনি ভাই। বিশ বছরের তফাত হতে পারে—কিন্তু তবু কি চিনতে পারব না ছেলেবেলার সঙ্গিনীকে?'

'লাইলি তখন পেণ্ট চড়িয়েছিল।'...বীরেশ্বর বোঝাতে থাকল।...'তাছাড়া এটা স্রেফ সাইকোলজিকাল ব্যাপার। একজন চেনা মানুষের আসলে কতটুকু আমাদের স্মৃতি ধরে রাখে? অল্প কিছুটা মাত্র—হয়তো কোন ভ্রূভঙ্গী, নাকের গড়ন, কথা বলার বিশেষ ধরন কাসির শব্দ, হাসির ধাঁচ, কণ্ঠস্বর—এ ধরনের বিশেষ কিছু জিনিস। অন্ধকারে বা আড়াল থেকে তাই শব্দ শুনে আমরা মানুষটিকে সনাক্ত করতে পারি। দূর থেকে দেখে ওই রকমই কোন বিশেষ ভঙ্গী আমাদের সনাক্ত করায় সাহায্য করে। এখন, সময়ের ব্যবধানে মানুষের এইসব অনেক ভঙ্গী আর শব্দ পুরো বদলে যাওয়া স্বাভাবিক। পুরো মানুষটিকে ইন টো টো কদাপি স্মৃতির পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব নয়! তাই দীর্ঘ সময় পরে কারো কোন ভঙ্গীর সঙ্গে স্মৃতিতে রাখা ভঙ্গীটির মিল থাকলে আমাদের সনাক্তকরণে সাহায্য হয়—তবে ভুলও হয় অনেক সময়। ভুল হলে বলি, হ্যাঁ—ঠিক এমনি একজন আমার পরিচিত ছিল বটে। যাই হোক, লাইলির ক্ষেত্রে তোর কী কী ফ্যাক্টর কাজ করেছে দ্যাখ্। প্রথম কথা: তোর লাইলি সম্পর্কে বাল্যের ইমেজ থেকে মনোমত গড়ে নেওয়া আরেকটা ইমেজ তুই গড়লেও গড়তে পারিস—তবে বলছিস, নাকি লাইলির কথা মনেই ছিল না। তাহলে নিশ্চয় সেই বালিকা ইমেজ তোর অবচেতনে ছিল। দ্বিতীয় কথা: বিশবছরে লাইলির

অসম্ভব সব পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার যে ভঙ্গীগুলো ছাগলচরানী মেয়ের মত ছিল, আজ তা অন্য ধরনের হতে বাধ্য। অত ডিটেলসে গিয়ে লাভ নেই। তৃতীয় কথা : আমার সাজেশানটা তোর মাথায় ছিল, অর্থাৎ প্রদীপের স্ত্রীর সঙ্গে তোর দেখা হতে পারে বলেছিলুম। কেমন? তাই ওকে না-চেনাটা খুবই নরম্যাল ব্যাপার। খুব স্বাভাবিকই।'

সকৌতূকে বললুম, 'কিন্তু ঠোঁট?'

'হুঁ, কবে চুমু খেয়েছিলি বলে বুঝি ঠোঁট দুটোও তোর এক্তিয়ারে থেকে গেছে! আরে হাঁদারাম, ঠোঁটের গড়ন বদলাতে লিপস্টিকের জুড়ি নেই। পাতলা ঠোঁট মোটা করে ফেলে। তার ওপর গগলস এক অসামান্য জিনিস। যাক্‌গে, রাত তিনটে বেজে গেল। শোন, লাইলি তোর সঙ্গে দেখা করবে। তুই দেখা করতে রাজী তো?'

'কেন? রাজী হব না কেন?'

'কারণ, একটু রিস্ক আছে—খুলেই বলছি। পুলিস ওকে ধরার জন্যে চারিদিকে ফাঁদ পেতে বেড়াচ্ছে। তোমার সঙ্গে ওকে কেউ দেখে ফেললে পুলিসের কানে তুলে দেবে—পুলিস ভাববে তুমি পার্টির নতুন আমদানী। এর ফলে তোমাকে বেকায়দায় পড়তে হতে পারে।'

মনে মনে হাসলুম। মুখে গাম্ভীর্য আর ভাবনা রেখে বললুম, 'সেও কথা। তা বীরু, সবদিক বাঁচিয়ে কোথায় দেখা হতে পারে—ঠিক করেছিস?'

'করেছি।'...বীরেশ্বর চাপা গলায় বলল।...'আগামীকাল সকালে ন'টার মধ্যে দুজনে ইরিগেশানের সেই ক্যাম্পে যাব। কেমন?'

'তারপর, তারপর?'...রুদ্ধশ্বাসে বললুম।

'আমি ইশারা দিলে তুই জঙ্গলের দিকে চলে যাবি। সরু পথটা ধরে যাবি কিন্তু। পথ ছাড়বিনে।'

'বেশ। তারপর?'

'কিছুদূর গিয়ে একটা টাটকা ভাঙা গাছের ডাল পথে পড়ে থাকতে দেখবি। ডালটার ডগা যেদিকে ঘোরানো সেইদিকে হাঁটতে থাকবি। সেদিকে যদি ঘন বন হয়, তবু যাবি কিন্তু। খুব সাবধানে লক্ষ্য রাখবি, কেউ তোকে ফলো করছে কিনা। যদি কোন লোক—সে যে-ই হোক, জেলেনী, কাঠকুড়োনী, চাষী বা মুসহর, চোখে পড়ে—এগোবিনে। তোর কাছে একটা পাখি-মারা বন্দুক থাকবে। বুঝতে পারছিস তো? তুই শিকারী।'

'হুঁ।'

'যদি সন্দেহজনক কিছু দেখিস, তাহলে সোজা ফিরে ক্যাম্পে চলে আসবি। আমি অপেক্ষা করব।'

'তাই হবে।'

'আর একটা কথা, আমু।'

'বল্!'

'যদি এইসব নির্দেশের কোন একটা অমান্য করে বা তুচ্ছ ভেবে লাইলির সঙ্গে বোকার মত দেখা করতে এগোও এবং তার ফলে লাইলির কোন বিপদ হয়, আমার পার্টি তোমাকে চরম দণ্ড দেবে, মাইণ্ড দ্যাট।'

'চরম দণ্ড কী?'

বীরেশ্বর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল, 'মৃত্যু।'

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলুম। দেয়ালঘড়ির টক টক শব্দটা শুধু শোনা যেতে থাকল। বাইরে তাকিয়ে দেখি জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

ডাকলুম, 'বীরু!'

'উঁ?'

'লাইলির সঙ্গে তোর ঘরেও তো দেখা করা যেত।'

'উঁহু। কাল রাতে লাইলি এখানে ছিল। কীভাবে পুলিস

টের পেয়েছিল সেটা। ইরিগেশানের জীপ নিয়ে রাতে অপেক্ষা করছিল। তারপর…'

বাকিটা আমি তো জানিই। বীরেশ্বর সেই ঘটনাটার বর্ণনা দিয়ে বলল, 'কাজেই লাইলি আপাতত কিছুদিন রাণীহাট আসছে না।'

এবার সে উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে। শুয়ে পড়। সকাল আটটায় ওঠাব—কেমন? দরজাটা ভেতর থেকে ভাল করে আটকে দে।'

ও চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিলুম। জানলার ধারে এসে বসলুম। এই জানলা থেকে পুবের ফাঁকা মাঠটা দেখা যায়। জানলার নিচেই একদঙ্গল হাস্নুহানার ঝোপ। এতক্ষণে টের পেলুম কী পবিত্র বস্তু হারিয়েছি! ঘর ভরে গেল সুগন্ধে।

কাল রাতে ওই ঝোপের নিচেই পুলিস অফিসার মুখার্জিরা নাকি বসে ছিল। আজ কেউ নেই তো? সাবধানে লক্ষ্য করলুম। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। তখন মন-প্রাণ ভরে হাস্নুহানার গন্ধে তন্ময় হয়ে স্মৃতির দরজা খুলে দিলুম। শিমুলিয়ার সেই ছেলেবেলার ওপর লাইলি নামে একটি বারো-তেরো বছরের মেয়েকে হেঁটে আসতে দেখলুম।…

পাঁচ

রাণীহাটের ইনফরমারটি কে, যদি আমাকে বলা থাকত, তাহলে আসন্ন চতুর্থ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যেত। ইনফরমারদের নাম আমাকে গোপন রাখা হয়েছে নাকি আমারই নিরাপত্তার স্বার্থে! এর কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাইনে।

বৃথা এখন হাত কচলানো। ইনফরমাররা না হয় আমার নাম জানল না আমার গোপনীয়তা আর নিরাপত্তার স্বার্থে, কিন্তু তাদের নাম আমাকে জানালে কী ক্ষতি হত? বরং কত কাজে লেগে যেত এখন!

পরে ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা একই দাঁড়াত। আমি কিছু যোগাযোগ করলেই ইনফরমার আমাকে চিনে রাখত। এবং ইনফরমার যতই করুক, পুরো বিশ্বাস তাকে করা চলে না। ফলে তার আমাকে চিনে রাখাটা সঙ্গত নয়। কর্তৃপক্ষ ঠিকই করেছেন তাহলে। এই চতুর্থ সুযোগটাও যে ব্যর্থ হত না, তার তো কোন মানে নেই!

মনে এই ওঠা-পড়া নিয়ে চা খাচ্ছিলুম সকালে। আটটা বাজছে। বীরেশ্বর বলে গেছে রেডি থাকতে। আর কী রেডি হব? আমার নিজস্ব ধরনে রেডি হতে হলে তো এক্ষুনি শিমুলিয়া গিয়ে অস্ত্রটা আনতে হয়! সেটা সন্দেহজনক হতে পারে বীরেশ্বরের কাছে।

তবে সবচেয়ে আক্ষেপ এই যে পুলিস বিভাগকে আমি একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকতে বলেছি কিছুকাল—যতক্ষণ না আমি ভিন্ন কিছু বলি। এখন ওদের কাকপক্ষীটিও আমাকে এড়িয়ে চলবে আমার কথা মত। এমন কি এলাকায় নিজেদের নরম্যাল রুটিন ডিউটি ছাড়া বিশেষ কিছু করার জন্যে উপস্থিতই থাকবে না।

আমার এই নির্দেশ স্পষ্টত দেখছি পর পর ক্ষতি করে যাচ্ছে আমারই। এখন যা অবস্থা, দরকার হচ্ছে ফের ভিন্ন নির্দেশ দিয়ে আমার ধারে-কাছে পুলিস বাহিনীর উপস্থিতি—এবং গোপন তৎপরতায় আমার সঙ্গে মুহুর্মুহু যোগাযোগ রাখা।

এইসব ভাবতে ভাবতে বীরেশ্বর একটা বন্দুক নিয়ে এসে পড়ল। বলল, 'চল, বেরনো যাক্।'

বাইরে গিয়ে বন্দুকটা আমার হাতে দিল সে। সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, 'ভয় নেই—লাইসেন্স আছে। বন্দুকটা আমার বাবার হাতের জিনিস। বিলিতি। কী ওজন দেখছিস? একটুও ধাক্কা মারে না। এই নে, কার্টিজগুলো রেখে দে পকেটে। কী? বন্দুক ছুঁড়তে পারিস তো?'

বললুম, 'পারি বইকি। কলেজ-জীবনে এন সি সি করেছি না? রাইফেলও ছুঁড়তে পারি।'

'বলিস কীরে!'···বীরেশ্বর আমার কাঁধে থাপ্পড় মারল।··· 'তাহলে তো তোকে আমাদের দলে টানতে হয়!'

'আলবাৎ।'···সোৎসাহে বললুম। 'খুব রাজী আছি।'

বীরেশ্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'ওসব তুই পারবিনে। ছেড়ে দে। আর আনু—'

'বল্।'

'কাল রাতে যা শুনেছিস, ভুলে যা।'

'চেষ্টা করব, ভাই। কারণ আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে আমার।' ···হেসে ফেললুম।

বীরেশ্বর আমার একটা হাত নিয়ে বলল, 'আমার বিশ্বাস আছে ···তুই এ সব নিয়ে কোথাও আলোচনা করবি নে। আর করলেই বা কী? তোকে যা বলেছি—পুলিস তা সবটুকুই জানে। আমার সম্পর্কে ওদের দরকার হচ্ছে—আইনের সামনে মেটিরিয়াল প্রমাণ দাঁড় করানো। সেটা পাচ্ছে না বলেই আমি গায়ে হাওয়া দিয়ে

বেড়াচ্ছি। আর সত্যি বলতে কী, কোন এ্যাকশনে তো আমি থাকিও নে। যা করার, ওরা সব করে।'

কথা বলতে বলতে আমরা গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলুম। সেই সময় দেখলুম, বাবুগঞ্জ থানার কয়েকজন পুলিস আর একজন সম্ভবত গ্রামের দফাদার হন্তদন্ত এদিকে আসছে। বীরেশ্বর থমকে দাঁড়াল। আমি বেশ খানিকটা চমকে উঠেছিলুম। বীরেশ্বরের গায়ে চিমটি কাটলুম। বীরেশ্বর হেসে বলল, 'ও কিছু না। আজ রাতে একটা ব্যাপার হয়েছে।'

কাছে এলে চিনতে পারলুম বাবুগঞ্জের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্স-পেক্টর মল্লিকবাবু রয়েছে। আমি দেখলুম, মল্লিকবাবু আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। বীরেশ্বরকে নমস্কার করে বললেন, 'আপনাদের গ্রামেই আজ একটা পেটি কেস পড়েছে, বীরেশ্বরবাবু! জানেন না?'

বীরেশ্বর তাচ্ছিল্য করে বলল, 'ও! হঁ্যা—শুনলুম গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।'

মল্লিকবাবু বললেন, 'দেখা যাক। পোস্টমর্টেম কী বলে।'

বীরেশ্বর হাসতে হাসতে বলল, 'মনের দুঃখে মলেও আপনাদের হাত থেকে রেহাই নেই দেখছি। সেই ভয়েই তো মরতে পারিনে!'

মল্লিকবাবু বললেন, 'উনি কে?'

বীরেশ্বর আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে আমি শুধু ছোট্ট একটা নমস্কার করলুম। ওঁরা চলে গেলে বললুম, 'গলায় দড়ি দিয়ে কে মরেছে?'

'ও একটা লোক—তুই চিনবিনে। কী খারাপ অসুখে ভুগছিল ক'বছর থেকে—আজ পুকুরপাড়ের গাছে গিয়ে ঝুলেছে। এইসব শালারা কেন যে জন্ম নেয় পৃথিবীতে—কী কাজে লাগে, বুঝিনে। শুধু তো বদমাইসি…' বীরেশ্বর নিষ্ঠুর মুখে বলতে বলতে থেমে গেল হঠাৎ।

বললুম, 'বদমাইসি করত বুঝি? কী বদমাইসি?'

বীরেশ্বর হাঁটতে হাঁটতে অস্পষ্টভাবে বলল, 'শালা পুলিসের টাউট ছিল।'

আমার বুক ধড়াস করে উঠল। পলকে বুঝতে পেরেছি, এই লোকটি কে। তাহলে কি গত রাতে বীরেশ্বরের লোকেরা ওকে গলায় দড়ি পরিয়ে ঝুলিয়ে মেরেছে?

আমি শিউরে উঠলুম চুপি চুপি। আর কোন কথা বললুম না ও সম্পর্কে। শুধু ভাবলুম, হায়, এখন যদি কোন উপায়ে মল্লিক-বাবুকে জানাতে পারতুম, আমি কোথায় যাচ্ছি—কার সঙ্গে দেখা হতে চলেছে!

কিন্তু কোন উপায় নেই। বীরেশ্বর আমার পাশে।

দুজনে নানা প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে নদীর ব্রিজে গিয়ে পৌঁছলুম এক সময়। দেখলুম, তাঁবুটা এখনও রয়েছে। একটু অবাক লাগল। তারপর দেখলুম, দূরবীনটা দাঁড় করিয়ে তাতে চোখ রেখেছে দাশগুপ্ত—আর সেনগুপ্ত একটা বিশাল মাপকাঠি নিয়ে—সেটা চওড়া কাঠের তৈরী এবং কালো-সাদায় ইঞ্চি-ফুট কাটা রয়েছে, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে রাখছে দাশগুপ্তর ইশারা মত। আশ্চর্য অভিনয়! আর সাহসই কম কোথায়?

দাশগুপ্ত আমাদের দেখে বলল, 'আসুন, আসুন। লোক আসবার আগেই ভাবলুম, নিজেরা কিছুক্ষণ কাজ করা যাক। আই কাণ্ট সিট আইডিল।'

সেনগুপ্ত সেই মাপকাঠিটা মাটিতে ফেলে সেখানেই বসে পড়েছে এবার। কী নিখুঁত অভিনেতা!

বীরেশ্বর বলল, 'রাত্রে ভয় পাননি তো সার? আমার লোকেরা ছিল তো?'

দাশগুপ্ত জবাব দিল, 'হ্যাঁ—ছিল। ভোরে সব গেল। আমাদের কোন অসুবিধে হয় নি।'

আমরা ঘাসের ওপর গাছের ছায়ায় বসে পড়লুম। নদীটার সম্পর্কে নানান আলোচনা করতে লাগল বীরেশ্বর। ইতিমধ্যে একজন-দুজন করে নানা গ্রামের মাতব্বর লোকেরা কীভাবে খবর পেয়ে আসতে শুরু করেছে। বীরেশ্বরকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। বাঁধ সম্পর্কে সবাই নিজের নিজের মতামত জানাতে চায় এঞ্জিনিয়ার সায়েবকে। আমি মনে মনে সকৌতুকে হাসছিলুম। দাশগুপ্ত সমানে শুনছে আর গম্ভীরভাবে মাথা দোলাচ্ছে। এক সময় সে সবাইকে নিরস্ত করে আবার দূরবীনে চোখ রাখল। সেনগুপ্ত যথারীতি মাপকাঠি নিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করতে থাকল দাশগুপ্তর ইশারা মত। ভিড়টা হাঁ করে ওদের কার্যকলাপ দেখছিল। এক ফাঁকে বীরেশ্বর আমার দিকে চোখ টিপে বলল, 'আনু, তাহলে ছ্যাখ, পাখি-টাখি কিছু মারতে পার নাকি। পিক-নিকটা জমবে তাহলে।'

ভিড় থেকে একজন বলল, 'পাখি মারবেন তো স্যার—সোজা বিলে চলে যান। খুব হাঁস আছে। আমি দেখে এসেছি।'

লোকটা আমাকেও সরকারী লোক ভেবেছে। বীরেশ্বর বলল 'হাঁস-টাস নয়—জঙ্গলে হরিয়াল পাবে, চলে যাও আনু।'

আমি বন্দুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বুকটা আবার কেঁপে উঠল একবার। লাইলি—সেই লাইলির সঙ্গে দেখা হবে!

সেনগুপ্তর পাশ দিয়ে আমাকে যেতে হল। দেখি, সে আড়-চোখে কুটিল দৃষ্টিতে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল—তাকে পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আমার মুহূর্মুহু গা শিউরে উঠল।

জঙ্গলে ঢুকে সরু পায়ে-চলা পথে পথে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় দাঁড়ালুম। সিগ্রেট ধরিয়ে দ্রুত ভেবে নিলুম, কী করা উচিত—কী উচিত নয়, কী বলব—কী বলব না লাইলিকে। সবচেয়ে ভাইটাল হচ্ছে, ওকে কোন কায়দায়, কখন, কোথায়, কীভাবে গ্রেপ্তার করা যায়—তার একটা নিপুণ ব্যবস্থা করে

ফেলা। এরপর আর সুযোগ না আসতেও পারে। বীরেশ্বরকে সবসময় পাব—লাইলিকে তো আর পাব না! কাজেই লাইলিকে ফের একা পাওয়া চাই। অতএব কোন বিশেষ ব্যাপারের ছলে ওকে আবার একা আমার মুখোমুখি আনতে হবে—সুবিধেমত জায়গায় অন্তরঙ্গতার সুযোগে নিরস্ত্র করে ফেলতেও হবে! তারপর···

মন শক্ত করলুম। আর নয়। আমার দুর্বলতা সাজে না। লাইলি এখন বীরেশ্বরের স্ত্রী—তাতে কোন ভুল নেই! পরস্পর তারা গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত। যে-লাইলিকে আমি ভালবাসতুম, সে তো এ লাইলি নয়। সে আমার মনে বেঁচে আছে—সেখানেই থাক। কাল দুপুরে বীরেশ্বরের সঙ্গে লাইলির ওই নির্লজ্জ নগ্ন কামকেলি দেখার পর আর তার প্রতি আমার কোন মোহ থাকাই উচিত নয়।

পা বাড়ালুম। সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। কোন লোক কিংবা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। কিছুদূর চলার পর দাঁড়াতে হল। সামনে পায়ের নিচে একটা সদ্যভাঙা গাছের ছোট্ট পাতাভরা ডাল পড়ে রয়েছে। ডালের ডগাটা বাঁ দিকে ঘোরানো—তার মানে আমাকে বাঁ দিকে যেতে হবে।

বাঁ দিকে ঘন ঝোপঝাড়, ওপরে উঁচু সব গাছের ডালপালা ছড়ানো—তাই রোদ পড়ে না—ছায়ায় অন্ধকারপ্রায়। পা বাড়াতে গিয়ে ফের চারপাশটা দেখে নিলুম। কিছু চোখে পড়ল না। নির্জন বনভূমি তার নিজস্ব শব্দাবলীর মধ্যে সমাহিত। পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁর ডাক, বাতাসের মর্মর। হঠাৎ মনে হল, প্রকৃতি একটা আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখে আমাকে অভ্যর্থনা করেছে। পলকে পলকে ছেলেবেলা আমাকে গ্রাস করতে লাগল। আমি উন্মন হয়ে পড়লুম।

সেই সময় কোত্থেকে রহস্যজনক ভাবে ভেসে এল যেন

কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ। সত্যি—না মিথ্যে গন্ধ? এখানে কোথাও কি কাঠমল্লিকার গাছ আছে? এই গ্রীষ্মে তার ফুল ফোটাবার সময়—সেটা ঠিকই। কিন্তু…

নাঃ, ওটা একটা হ্যালুসিনেসানই হবে। স্মৃতির ছলনা মাত্র। আর পাওয়া গেল না গন্ধটা। নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি ক্রমশ। একটা কিছু না পাওয়ার গভীর দুঃখ টলমল করছে। শত চেষ্টাতেও এই বিষাদের বোধ আর আবেগটা তাড়াতে পারলুম না।

আমার মুখ থেকে অস্ফুট একটা ডাক ছিটকে বেরিয়ে গেল—'লাইলি!'

আবার কান পাতলুম। কোন সাড়া নেই। ছায়াময় বনভূমিতে নির্জনতা থম থম করছে। আবার দুপা এগিয়ে ডাকলুম—'লাইলি!' কিন্তু কোন সাড়াই এল না।

শুকনো পাতার শব্দ হল কোথায়। চমকে উঠে ডাকলুম—'লাইলি!'

তবু সাড়া নেই। আবার হাঁটতে থাকলুম। বীরেশ্বর কি তাহলে আমার সঙ্গে রসিকতা করল? নাকি ওরা টের পেয়ে গেছে আমার সব খবর? আমি কি অবশেষে বোকামি করে ওদের ফাঁদে পা দিয়ে বসছি?

লক্ষ্য করলুম এত ঘেমেছি যে বন্দুকটা পিছলে যাচ্ছে হাতে! যদি হঠাৎ এখন আক্রান্ত হই, পাখিমারা ছররা কার্তুজ দিয়ে কতটা আত্মরক্ষা করতে পারব জানি না। তবু শক্ত হতে চেষ্টা করলুম। হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে কোথাও। সামনে এখন ঘন দুর্গম ঝোপঝাড়। পা বাড়ানো কঠিন।

হঠাৎ স্পষ্ট শুনলুম, আমার নাম ধরে কে ফিস ফিস করে ডাকল—'আনু! আনোয়ার!'

তারপরই সামনে ঝোপের ওদিকে যাকে দেখা গেল, চিনতে

পারলুম না। ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা, ব্লাউজবিহীন গা, তামাটে রং, নাকে নাকছাবি, রুক্ষ চুল, নিতান্ত একটি কাঠকুড়োনি মেয়েই বটে। ওঁর কাঁখে একটা কাঠকুটো কুড়োবার ঝুড়ি দেখা যাচ্ছিল। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। তার মুখে গাছের পাতার ফাঁক গলিয়ে আসা রোদ্দুর ঝকমক করছিল। আমি রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠলুম—'লাইলি!'

লাইলি হাত তুলে ইশারায় ডাকল।

সারা শৈশব ও কৈশোর ওর মুখে ঝলমল করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। তীব্র ঘ্রাণ ভেসে এল কাঠমল্লিকার। পাখিরা ডাকতে লাগল। প্রজাপতিরা দৌড়ে এল। লক্ষ লক্ষ ফুল ফুটতে দেখলুম চারপাশে। একটি সরল নিষ্পাপ ছেলে আমার বুকের ভিতর থেকে ভুলে যাওয়া ভাষায় চিৎকার করে উঠল—লাইলি, আমার লাইলি!

এত ঘন কাঁটাভরা ঝোপঝাড় যে প্রতিটি পা ফেলতে মনে হল এক একটা যুগ চলে যাচ্ছে। এ কি স্মৃতির দিকে—বয়সের উজানে পাড়ি দেওয়া? লাইলির কোমর ডুবে আছে ঝোপে। তার ঠোঁটের আর চোখের হাসি ছবির মত অনন্ত সময়ের পটে যেন আঁকা। যেন তা জীবন্ত নয়।

হঠাৎ আমার চমক খেলে গেল। ওই রোদরাঙা মুখে আর হাসিতে কী যেন একটা আছে। আন্দাজ পাঁচ মিটার দূরত্ব ছিল—প্রতিটি মিটার পার হতে হতে ক্রমশ সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা চোখে স্পষ্ট হল।...চার...সাড়ে তিন...তিন...আড়াই...পথ ফুরোয় না, ফুরোয় না! 'লাইলি'—ডেকে উঠছিল একটি কিশোর। তারপর যেন লাইলি তার ঝুড়ি থেকে কী একটা তুলে নিল।

অমনি দুপা পিছিয়ে এলুম। দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা আমার মাথায় অনেক যত্নে যে বিপদ সংকেতের যন্ত্র তৈরি করেছিল, সেখানে লাল বাল্ব জ্বলে উঠল এবং সেই পারমাণবিক এ্যাপারেটাস থেকে যথারীতি সাইরেন বাজতে থাকল কাঁপাকাঁপা সুরে।

কিন্তু আমার হাতে এখন বীরেশ্বরের পাখিমারা বন্দুক আর পকেটে কয়েকটা ছররা কার্তুজ। বড়জোর সাংঘাতিক আহত করা যায় কাকেও, অন্তত পয়েন্টব্ল্যাংক রেঞ্জে।

এদিকে লাইলির সেই অদ্ভুত হাসিটা ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেছে এবং সেখানে এখন জেগে উঠেছে একটা সূক্ষ্ম বাঁকা রেখা, যা ক্রুর আর রহস্যময়। তার হাতে রিভলবার। রিভলবারটা তুলে সে তাক করেছে আমার দিকে। কয়েকটি সেকেণ্ডে এসব ঘটল।

ভয় দুঃখ রাগ অপমানবোধ আমাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। গলায় বোবা ধরে গেল। একটিমাত্র চিৎকারই করা যেতে পারে এখন—'লাইলি কি আমাকে খুন করতে চাও?' কিন্তু কিছু করা গেল না। বুঝতে পারলুম, ফাঁদটা আমি টের পাইনি।

পরের মুহূর্তগুলো আমার স্বাভাবিক আত্মরক্ষার বোধটাকে জাগিয়ে দিল এবার। বন্দুক দিয়ে লাইলির রিভলবার ধরা হাতে আঘাত করা ও সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বা বাঁয়ে লাফ দিয়ে সরে যাওয়া দরকার। সে একেবারে মুখোমুখি রয়েছে।

লাইলি ভুরু কুঁচকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। তার দুচোখে ওই উজ্জ্বলতা ঘৃণা মেশানো হিংসা ছাড়া আর কী হতে পারে?

মতলবটা কাজে লাগানোর জন্যে যেই তৈরি হয়েছি, ডান পাশের ঝোপ থেকে চাপা আওয়াজ এল—'বন্দুকটা ফেলে দিন।' বাঁ পাশেও কে হেসে উঠল।

তাহলে সত্যিসত্যি আমি ফাঁদে পা দিয়েছি এবং আটকে গেছি। ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলুম। ডানদিকের ঝোপ ঠেলে এগিয়ে আসছে সেই দাশগুপ্ত, তার হাতে সেই অদ্ভুত রাইফেলটা রয়েছে। আর বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে—আর কেউ নয়, ধূর্ত বীরেশ্বর!

আমি ধরা পড়ে গেছি নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমার কতটুকু ওরা জেনেছে আঁচ না করে ধরা দেওয়া উচিত হবেনা।

বীরেশ্বর হাসতে হাসতে বলল—'বন্দুকটা ফেলে দাও, আনু। লাইলি চায় না কেউ বন্দুক হাতে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসুক!'

বন্দুকটা তার দিকে ছুড়ে দিতেই সে লুফে নিল। তারপর লাইলির দিকে ঘুরে বলল—'ঠিক আছে লাইলি। তোমার প্রেমিকের দায়িত্ব এখন আমার। তুমি কেটে পড়ো।'

লাইলি ঘুরে পা বাড়াল। একটা ভারি প্রশ্বাসের আওয়াজ পেলুম যেন। লাইলিরই কি? একটানা উত্তেজনার অবসান ঘটলে এমন দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আমি তার হাঁটুর নিচেকার নিটোল মাংস দেখছিলুম। কাঠকুড়োনি মেয়ের ভঙ্গীতেই সে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তার দিকে আর তাকাতে পারলুম না। মনে হল, এর চেয়ে বড় অপমান জীবনে আর কিছু থাকতে পারে না।

এবার বীরেশ্বর কাঁধে হাত রাখল। হাতের ওজনটা বেশ জোরালো। নিশ্চয় বন্ধুত্বসূচক নয়। কাঁধ নাড়া দিয়ে বললুম—'বীরেশ্বর, এর কী মানে হয়?'

বীরেশ্বর হাসতে হাসতে বলল—'তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একটু ফাজলেমি করছি হয় তো।'

সতর্ক হলুম। বললুম—'কিছু বুঝতে পারছিনে বীরু। তুমি বললে, লাইলি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমাকে তুমিই পাঠালে। তারপর...'

বীরেশ্বর আমার কাঁধে তার থাবাটা আরও শক্ত করে বলল—'ওসব কথা থাক, আনু। আমি খুব দুঃখিত যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে হয়। তপু, একে নিয়ে যা তাহলে।'

আতঙ্কে বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম। সেই হাসিটা নেই, ভীষণ গাম্ভীর্য থমথম করছে ওর মুখে। হাত কাঁধ থেকে তুলে নিতেই দাশগুপ্ত অথবা তপু রাইফেলটা বুকে ঠেকিয়ে বলল—'টুঁ শব্দটি করবেন না, স্যার। চলে আসুন।'

শেষ চেষ্টায় বীরেশ্বরকে বলে উঠলুম—'বীরু, একি করছিস তোরা? বলবি তো খুলে? মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিনে যে!'

অমনি বীরেশ্বর আমার গালে চড় মারল। মাথা ঘুরে গেল। পড়ে গেলুম। তখন তপু নামে লোকটা আমার জামার কলার ধরে টেনে তুলল। অভিনয় করা আমার পক্ষে বরাবর সহজ। অভিনয় ছাড়া আমার পেশায় কাজ হয় না। কিন্তু এত সহজে চোখে জল এসে যাবে—বিনা চেষ্টায়, ভাবিনি। এবং ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে উঠলুম—'বীরু আমাকে মারলি তুই! কেন—কী করেছি আমি?

বীরেশ্বর আমার পাছায় এক লাথি মেরে বলল—'শাট্ আপ শালা টিকটিকির বাচ্চা। তপু, নিয়ে যা। আমি ব্রিজে গিয়ে বসছি। ঝটপট ফিরে আসবি।'

তারপর বন্দুকটা দুহাতে নাচাতে নাচাতে চলে গেল সে। নাঃ, আর অভিনয় চলবেনা। ওরা আমার পরিচয় যেভাবে হোক জেনে গেছে। রিপোরটে যা বলা হয়েছে, ওরা তার চেয়েও ধুরন্ধর এবং সতর্ক। ওদের লোক সবখানে ওঁৎ পেতে আছে, এতে কোন ভুল নেই। মুহূর্তের জন্যে আমার সন্দেহ জাগল, তাহলে কি পুলিশের মধ্যেও ওদের চর রয়েছে? তা না হলে আমার পরিচয় জানা কোন ভাবেও সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে।

তপু বা দাশগুপ্ত রাইফেলের নল ইসারা করে বলল—'চলে আসুন স্যার! বীরুদার মেজাজ খারাপ করেছেন, আমারটা খারাপ করবেন না প্লীজ! আমার ধাত আবার অন্যরকম।'

শান্তস্বরে বললুম—'কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?'

'চলুন না! বলেছি, টুঁ শব্দ করবেন না। তাহলে পাছায় লাথি খাবেন ফের। হুঁ—এদিকে!'

আমার সঙ্গে আন্দাজ আড়াই মিটার দূরত্ব রেখে হাঁটতে থাকল। উঁচু গাছপালার ভিড় কমে ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছিল সামনে। ক্রমশ

সন্দেহ বাড়ছিল। কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে? মেরে ফেলবে নাকি? এই জঙ্গলে মানুষ মেরে পুতে ফেললে কেউ টের পাবেনা কোনদিন। লোকটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তার শারীরিক সামর্থ মাপলুম। গায়ের জোরে এঁটে ওঠা কঠিনই হবে। তাছাড়া হাতে ওর অটোমেটিক রাইফেল। সম্ভবত বিদেশি জিনিস। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি টের পেয়ে সে ধমক দিল—'সামনে তাকিয়ে হাঁটুন!'

বুঝলুম তার চোখদুটো সবসময় আমার দিকে লক্ষ্য রেখেছে। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছিল এতক্ষণে। একটা ভয়ঙ্কর শূণ্যতা সামনে ভেসে উঠছিল। এই রোদঝলসানো উদ্ভিদজগত মুছে যাচ্ছিল বারবার। পাখির ডাক দূরের গভীরতায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল। অথচ সারাক্ষণ সেই কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ ভাসছিল। একটি স্মৃতি হালকা ও ভীরু প্রজাপতির মতো আমাকে অনুসরণ করছিল।

কিন্তু না—এখন মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। ঘৃণা ও হিংসা, ধূর্ততা ও ক্ষিপ্রতা—এইসব জিনিস চাই। কোন স্মৃতি নয়, প্রেম নয়, লাইলি নয়—কোন সৌন্দর্য নয়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালুম। প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম আর কী! আমার সামনে কয়েকটা ঘন বিশাল ঝোপ—নাটা ও কুঁচফলের জঙ্গল, তার ওদিকে একটা নিচু বাঁধের ওপর বুনো জামের দীর্ঘ দেয়াল। জামফল পাকার ঋতু এগিয়ে আসছে। উজ্জ্বল রোদে সবুজ জামগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আর তার ওপাশে কাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। আমি তাকানোর সঙ্গেসঙ্গেই সে বসে পড়ল এবং ঠিক খরগোসের মতো নিচের উঁচু উলুকাশের মধ্যে ঢুকে গেল। কানগুলো দুলেদুলে স্থির হল।

লাইলি! লাইলি ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাহলে? একবার ভাবলুম, ওর নাম ধরে ডাকি—পরে ভাবলুম, যেভাবে ও লুকিয়ে পড়ল—তাতে বোঝা যায় এই ভপুটাকে দেখা দিতে চায় না সে। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে লোকটা তেড়ে উঠল 'চলে আসুন।'

কোথাও আর কোন লোক নেই। কোন রাখাল, কাঠকুড়োনি মেয়েরা, কিংবা কোন মুসহরও আজ জঙ্গলে যেন আসেনি।

সামনের ঝোপে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার চমকে উঠলুম। তিনটে লোক চুপচাপ বসে রয়েছে। একটা কবরের সমান যথেষ্ট গভীর গর্ত খোঁড়া রয়েছে, তার দুধারে মাটি উঁচু করা। তার ওপর তিনটে কোদাল পড়ে আছে। ঝোপের ছায়ায় বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যে একজনকে বাবুশ্রেণীর মানুষ মনে হল। তার পরনে প্যান্টশার্ট, হাতে একটা বন্দুক। অন্য দুজন গ্রাম্য মজুর শ্রেণীর লোক। তাদের একজনের হাতে একটা বল্লম, অন্যজনের হাতে একটা লম্বা দা। মুহূর্তে সবকিছু সাদা বা ধূসর হয়ে পড়ল আমার চোখে। স্পষ্ট হল, কী ওরা করতে চায়। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় আমাকে চাঙ্গা থাকতেই হবে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে আগেও বারকয়েক পড়তে হয়েছে। কিন্তু সে ছিল শহর, এ হচ্ছে গ্রামের এক নির্জন জঙ্গল। যা করতে হবে, তা নিজেকেই। কোন সাহায্য মিলবেনা।

একটু পস্তানি হল। এতক্ষণ একজনমাত্র লোক আর একটি রাইফেল ছিল। চান্সটা কেন নিলুম না? এবার এতগুলো সশস্ত্র লোকের সঙ্গে একা নিরস্ত্র লড়তে যাওয়ার মানেই মৃত্যুকে এগিয়ে দেওয়া।

তবু একটু বোঝাপড়া করে ফেললুম নিজের সঙ্গে—চান্স নেব, নাকি নিজের মৃত্যুকে বরণ করব নিঃশব্দে? ঠিক করলুম—চান্স নেব।

লোকগুলো আমাকে দেখছিল। কিন্তু পাথরের মূর্তি যেন সব। প্রত্যেকটি চোখে জানোয়ারের হিংস্রতা জ্বলজ্বল করছে। বন্দুকধারী এবার উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর আমার দিকে বন্দুকের নল ইসারা করে গর্তে নামতে হুকুম দিল।

জায়গাটার একটু বর্ণনা দরকার। কবরটা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। আমি দাঁড়িয়ে আছি পূর্বদিকে মাঝামাঝি জায়গায়—পায়ের এক মিটার দূরে মাটির স্তূপ শুরু হয়েছে। সেই রাইফেলধারী তপু রয়েছে আমার ডাইনে এবং একটু পিছনে আরও দু মিটার দূরে অর্থাৎ কবরের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকেও সোজা দুমিটার দূরে বন্দুক ধারী দাঁড়িয়েছে কবরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মাটির স্তূপে। বাকি দুজন বসে আছে কবরের দক্ষিণে মাটির ওপর। মাটি নরম এবং ভিজে। কবরের পশ্চিমে আন্দাজ ত্রিশ বর্গমিটার ফাঁকা জমি—তারপর উলুকাশের ঝোপ, তার পিছনে নিচু বাঁধ—যার ওপর ঘন জামগাছের দেয়াল। কবরের উত্তরে টানা ঝোপঝাড় নদী পর্যন্ত এগিয়েছে। নদী দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ মিটার দূরে। কবরের দক্ষিণে কিছু ঘন ঝোপ—তারপর বড়বড় কিছু হিজল ভাঁট শ্যাওড়া আর ভেলাগাছের জটলা। আমার পিছন অর্থাৎ কবরের পুবদিকেও তাই।

কয়েক মুহূর্তে পটভূমিটা জরীপ করে নিলুম। তারপর বললুম—'আমাকে আপনারা মেরে ফেলবেন তাহলে?'

সামনের বন্দুকধারী শিস দিয়ে ইসারায় বলল—'ঝটপট নামো!'

ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়ে বললুম—'ঠিক আছে। কিন্তু আপনারা তো জানেন—আমি মুসলমান। মরার আগে অজু করে পবিত্র হতে চাই। আমাকে দয়া করে একটু জল এনে দিন।'

বসে থাকা বল্লমধারী বলল—'শালা বুলি জানে ভালোই।' তারপর হাসতে লাগল।

ধরা গলায় বললুম—'আপনারা দয়া করে আমার ধর্মকে অসম্মান করবেন না।'

'চোওপ শালা টিকটিকি! কবরে নাম শিগগির!' বন্দুকধারী খাপ্পা হয়ে বলে উঠল।

কবরে নামলে আর কিছু করা যাবে না ভালই জানি। কিছু

করতে হলে এখনই। এরা আমাকে কথা বলতে দিতে চায় না। তাছাড়া ভেবে দেখলুম, বেশি কথা বললে হয়তো ওরা কবরে নামাঅব্দি অপেক্ষা না করতেও পারে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠলুম—প্রচণ্ড বাজখাঁই চেচানি—'সাপ! সাপ! সরে যান!'

গলায় অমন একশোটা বিউগলের আওয়াজ আসতে পারে ভাবিই নি। রাইফেলধারী তপু এর জন্যে নিশ্চয় তৈরী ছিল না। এই ব্যাপারটা ওরা কল্পনাও করে নি। মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক একটা চমককে কাজে লাগাতে দেরি করলুম না।

তপু লাফিয়ে সরে আসছিল। মুহূর্তেই ওর রাইফেলটা এক হঁাচকা টানে কেড়ে নিয়ে বন্দুকধারীকে গুলি করলুম—ঠিক দুই ভুরুর মাঝখানে। সে কবরে গড়িয়ে পড়ল। তপু পড়ে গিয়েছিল হ্যাঁচকা টানে। দ্বিতীয় গুলি তারও দুইভুরুর মাঝখানে ঢুকল পয়েণ্টব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। সে একবার বেঁকে সোজা হয়ে গেল।

দা আর বল্লম তখনও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে আছে। তাদের দিকে ঘুরতেই বল্লমধারী ডিগবাজী খেয়ে পিছনের ঝোপে ঢুকল। দাধারী পা ফসকে পড়ে গেল কবরেই—বন্দুকধারীর ওপর। আরেক গুলিতে সে ঘাড় দুমড়ে পড়ে রইল। বল্লমধারী ঝোপের আড়ালে দৌড়চ্ছে। অবশ্য বল্লম কবরের ধারেই পড়ে আছে। রাইফেলটা দ্রুত পরখ করে নিলুম। পরপর পাঁচটা গুলি ছোড়া যায়। এ আসলে চীনা রাইফেল।

লোকটার চলে যাওয়া ঝোপ নড়া দেখে টের পাচ্ছিলুম। এখনও দুটো কার্তুজ রয়েছে। ওকে শেষ করার জন্যে মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে তাকে হারিয়ে ফেললুম। সেই সময় মনে পড়ে গেল, বাঘিনীটা খুব কাছাকাছি কোথাও আছে।

পরপর তিনবার গুলির প্রচণ্ড শব্দ হয়েছে। এতে তার কৌতূহল জাগতে পারে!

এবার বেশ বিপদে পড়ে গেলুম। কখন কোত্থেকে তার রিভলবারের গুলি আসবে জানি না। চারপাশে ঘন জঙ্গল। তাই মরীয়া হয়ে দৌড়ে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছবার চেষ্টা করলুম।

উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তরে কবরের পাশ দিয়ে এগোলে নদীতে নামা যায়। সেখানে পৌঁছতে পারলে বিপদ অনেকটা কমবে। কিন্তু ব্রিজে নিশ্চয় বীরেশ্বর অপেক্ষা করছে তপুর। দেখা যাক্।

প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত হবার ভয় নিয়ে দৌড়ানোর চেয়ে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা আর থাকতে নেই। উদ্ভিদজগতকে সহস্রচক্ষু প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর মনে হচ্ছিল।

কবরের কাছাকাছি আসতেই থমকে দাঁড়াতে হল। লাইলি!

লাইলি চেহারা বদলেছে কখন। মোটামুটি ভদ্র বেশ। হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। হাতে সেই রিভলবারটাও নেই।

সে কবরের ধারে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে মড়াগুলো দেখছে। দূর থেকেও তার মুখের বিস্মিত ভাব স্পষ্ট টের পাচ্ছিলুম।

হয়তো বিস্ময় আর আতঙ্ক বেশি বলেই আমার পায়ের শব্দ সে টের পায়নি। আমাকেও লক্ষ্য করে নি। তাই পা টিপে টিপে কবরের দক্ষিণদিকে ঝোপের আড়ালে চলে গেলুম। তারপর রাইফেলটা তাক করে ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে ডাকলুম—'লাইলি!'...

ছয়

আমার ডাক এবার নিশ্চয় প্রেমিকের মতো ছিল না। হত্যার নিজস্ব নিয়ম নিজস্ব প্রবণতা আছে। হত্যার নেশা আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল। শুধু আমিই জানি, রাইফেলের একটি গুলির বদলে একটি মুখের শব্দ ছুড়তে আমার কতটা কষ্ট হয়েছিল। নিজের হাতের আঙুল—যা অটোমেটিক ট্রিগারে রাখা ছিল, তাকে থামিয়ে রাখতে আমার শরীরে রক্ত ঝড় তুলেছিল। কিন্তু মানুষই এমনটি পারে। বাঘ কোণঠাসা হলে সামনের কাকেও রেহাই দেয় না। মানুষ মুহূর্তের জন্যেও থমকে দাঁড়ায়।

পটভূমিটার কথা ভাবলে এখনও রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। গর্তে দুটো এবং ঝোপে ও ঘাসে একটা মানুষ পড়ে রয়েছে। তখনও তাদের কেউ বেঁচে থাকতেও পারে। গর্তের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং মরীয়া ঘাতক তার নাম ধরে ডাকল। অথচ তাকে বাঁচতে হলে তখুনি পালাতে হবে। শুধু শত্রুদের ভয়ে নয়, নিজের নার্ভও তখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে।

মনে পড়ছে, যখন ডাকলুম—আমার পাদুটো থরথর করে কাঁপছিল। গলার স্বরও কেঁপে গিয়েছিল। আর, আমি তো সামরিক বিভাগের লোক নই—যাদের ফ্রন্টলাইনে যেতে হয়। তাই এরকম নার্ভাস হয়ে পড়া খুবই সহজ ছিল আমার পক্ষে।

আমার ডাক শুনেই লাইলি ঘুরল। তার মুখে ঘামের অজস্র ফোঁটা, মাথার ওপর গ্রীষ্মের খর সূর্য। ভীষণ লাল দেখাচ্ছিল মুখটা। নাকের দুপাশে একটু কুঞ্চন। ঠোঁট দুটোয় ভাঁজ। কিন্তু চোখে এখন সেই ক্রুরতার ছাপ নেই। ডানহাতটা সোজা উরু বরাবর ঝুলছে। বাঁহাতটা বাঁকানো রয়েছে পেটের দিকে এবং কুনুইয়ের কাছে কালো একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, মাঝারি সাইজের। তার

পরনে ফিকে খয়েরি একটা তাঁতের শাড়ি, জামাটাও একই রঙের—কিন্তু হাতাকাটা নয়। মাটির স্তূপের ওপর তার সাদা দুটো খালি পা—স্থির।

লাইলি ঘুরে আমার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কোন কথা বললনা। এর ফলে আমি ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। কী করা উচিত, কিছুতেই মাথায় এলনা। এই স্ত্রীলোকটিকে জ্যান্ত বা মড়া অবস্থায় গ্রেফতার করার অধিকার আমার আছে। এবং এর জন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে এখানে। একে এবার পেয়েও গেছি মুখোমুখি একা। অথচ মাথায় আসছে না এখন ঠিক কী করা দরকার। তাছাড়া আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবেনা। এখনই যেকোন চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জীবনে এমন পরিস্থিতি আসবে, ভাবতেও পারি নি। চেষ্টা করলুম একটা সিদ্ধান্ত নিতে। ট্রিগারে চাপ দিলেই সব রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু বীরেশ্বর বলেছিল, রাষ্ট্র একটা ভয়ঙ্কর খাঁচাকাল কিংবা অন্ধ দানব। দ্রুত ভেসে এল কথাটা এবং আমার সিদ্ধান্তকে গুলিয়ে দিল।

একটা বিদ্রোহের ভাব পেয়ে বসল সঙ্গেসঙ্গে। মনে হল চেঁচিয়ে বলি, আমি তোমাদের গোলাম হতে চাই না। রাষ্ট্র সরকার দেশ সমাজ অনেক বড় আর জটিল ব্যাপার। এই মেয়েটিকে খুন করে কাদের কতটা মঙ্গল হবে আমার জেনে কোন লাভ নেই।

লাইলির দিক থেকে কোন প্ররোচনা এলে অর্থাৎ সে তার সেই রিভলবারটা বের করে বসলেও অবশ্য একটা অজুহাত পেতুম। কিন্তু সে কিছুই করছেনা। আমার হাত ঘামে পিছল হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ দেখি ওর ঠোঁটদুটো কাঁপছে। তারপর সারামুখে একটা শব্দহীন আর্তনাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর সে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—'আনুদা, আমাকে আপনি মেরে ফেলবেন?'

জবাব দিলুম না। তখনও সিদ্ধান্তে পৌছানোর চেষ্টা করছিলুম।

ভাঙ্গাগলায় ও ফের বলে উঠল—'আন্নুদা। কেন আমাকে মারবেন? কী করেছি আপনার?'

ভাবলুম, ধূর্ত স্ত্রীলোকটি সময় নিচ্ছে—কথা বলার ছলে দেরি করিয়ে দিতে চাচ্ছে। ঠোঁট কামড়ে ধরে দ্রুত এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলুম। কেউ কোথাও নেই। ওর কথার জবাব দেওয়ার মানেও হয় না। ওকে খুন করা যে এখন অন্যায় কিছু নয়, তা কি ও বোঝেনা? এ অবস্থায় অন্য কেউ হলে এতটা সময় দিতনা, তাও কি ও টের পাচ্ছে?

হঠাৎ ও অস্ফুট কেঁদে ফেলল।...'আন্নুদা, আমাকে মারবেন না—আমি ধরা দেব। চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে।'

ঠিক এই সিদ্ধান্তটাই নিতে চাচ্ছিলুম যেন। ওর কথা শোনা মাত্র আমার চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সত্যি বলতে কী, মনের জোরও ফিরে পেলুম এতক্ষণে। বললুম—'নদীর দিকে চলো! কুইক!'

ও আগে আগে হাঁটতে থাকল। আমি ওর যথেষ্ট তফাতে চারদিকে সতর্কচোখে লক্ষ্য রেখে এগোলুম। এদিকে নদীর পাড় খাড়া। একখানে ধস ছেড়ে নদীগর্ভে স্তূপের মতো মাটি জমেছে। লাইলি সেখানেই লাফিয়ে নামল। তারপর আমি নামলুম। নিচে একফালি হাল্কা স্রোত বইছে। স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জলে পা রাখতেই সব উত্তেজনা ও ক্লান্তি চলে গেল। তাড়াতাড়ি জল খেয়ে নিলুম। মুখে ও ঘাড়ে জল দিলুম। কিন্তু সবসময় ওর দিকে চোখ ছিল। লাইলি চরে দাঁড়িয়ে ব্রিজের দিকে তাকিয়েছিল। ব্রিজটা মাইলটাক পূবে রয়েছে। চোখ ঝলসানো রোদে সেখানটায় সাদা ঢেউয়ের কাঁপন দেখা যাচ্ছে। গাছের আড়ালে নকল ইরিগেশন অফিসারদের তাঁবুটাও দেখতে পেলুম। বীরেশ্বর ওখানে বসে অপেক্ষা করছে।

লাইলি ব্রিজের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। এগিয়ে এসে বললুম—'এক মিনিট! তোমার ব্যাগটা দাও।'

নিঃশব্দে ব্যাগটা আমাকে ছুড়ে দিল সে। খুলে দেখলুম, একটা তোয়ালে, গগলস, আর কী সব টুকিটাকি রয়েছে—রিভলবারটা নেই।

তখন বললুম—'রিভলবারটা কোথায়? বের করো শিগগির!'

লাইলি জবাব দিল—'ফেলে দিয়েছি।'

ধমক দিয়ে বললুম—'চালাকি করোনা! শিগগির বের করে দাও।'

লাইলি হাসবার চেষ্টা করল। —'বিশ্বাস করছেন না? বেশ তো—আমাকে সার্চ করে দেখুন।'

একটু ইতস্তত করার পর কাছে এগিয়ে গেলুম। তারপরই টের পেলুম ওর শরীর হাতড়াতে যাচ্ছি! শরীর—লাইলির সেই শরীর!

লাইলি আমাকে থামতে দেখে হাসল। তারপর হঠাৎ নিজের শাড়িটা খুলে একপাশে গরম বালির ওপর ছুড়ে ফেলল। তার পরনে একটা কালো সায়া আর গায়ে একটা ব্লাউস। হ্যাঁ—একটা অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য এবং যৌবন নিশ্চয় চোখের সামনে গ্রীষ্মের রোদে ঝলসাচ্ছে। কিন্তু আমার মন এখন অন্যসুরে বাঁধা। সে সায়ার ফাঁস খুলে সায়াটা ঝাড়ল, তার উজ্জ্বল সাদা নাভি কয়েকপলক দেখা দিয়ে হারিয়ে গেল। তারপর সে আমার দিকে পিছন ফিরে পাছার দিকটাও দেখিয়ে দিল। এবং আবার মুখোমুখি ঘুরে বলল—'আর কোথায় লুকিয়ে রাখব ভাবছেন?'

আমার দৃষ্টিতে সন্দেহ আঁচ করে সে সায়ার ফাঁসটা মুঠোয় ধরে বলল—'আপনার সাহস থাকলে নিজে দেখতে পারেন!'

ভুলেই গিয়েছিলুম যে সে গৃহস্থ মেয়ে নয়। এ ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুতেই ওকে বিশ্বাস করা যায় না। তাই আর একটুও দ্বিধা না করে হাত বাড়ালুম। ডানহাতে রাইফেল এবং সেটা অটোমেটিক। তাই যথেষ্ট সাবধান হতে হল। বাঁহাতটা প্রথম ওর পাছার দিকটায় রাখলাম। তারপর হাতটা ঘুরতে ঘুরতে

সামনে এল। তখন আমি যন্ত্র ছাড়া কিছু নই। সায়াটা তুলে সে উরু দুটো দেখিয়ে ছিল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—'বোতামের ক্লিপগুলো খুলে দিন।'

ব্রেসিয়ারের ওপর আমার আড়ষ্ট হাত নেমে গেল। তার স্তনের কোমলতায় ঘুরে সেই অনুভূতিহীন হাত যখন আমার কাছে ফিরে এল, তখন দেখলুম—আমার কাজটা যথারীতি প্রফেশানাল হয়ে চুকেছে। এমন কাজ আগেও অনেকবার করতে হয়েছে। ফুল-বা গান বস্তীর কুখ্যাত মেয়েগুণ্ডা অতসী দাসীর কথা মনে পড়ছিল। সেও এমনি করে বডিসার্চ করতে দিয়েছিল। কিন্তু সে ছিল রাতের ব্যাপার। এখন তো দিন—উজ্জল রোদ এবং এই মেয়েটির শরীর একদিন আমার কাছে সবচেয়ে কাম্য সবচেয়ে পবিত্র ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, এতটুকু বিকার মনে জাগল না। চমৎকার একটি মানুষ কুকুর তার রাষ্ট্র নামক প্রভুর নির্দেশ অদ্ভুত দক্ষতায় পালন করল।

কিংবা এমনও হতে পারে যে আমি আসলে মৃত্যুভয়ের আদিম আবেগেই এই কাজটা ভালভাবে করে যেতে পারলুম।

বললুম—'ঝটপট শাড়ি পরে নাও। ওপারে চলো।'

সে শাড়িটা পরে ফেলল। ব্যাগটাও কুড়িয়ে নিল। তারপর গরম বালির ওপর লম্বা পা ফেলে এগোল। খালি পায়ে চলতে কষ্ট হচ্ছিল বোঝা যায়। ওপারটা বেশ ঢালু। তরমুজের ক্ষেতের মাথায় একটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছিল। কুঁড়ের ভিতর কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এতক্ষনে ঘড়ি দেখলুম—এগারোটা সাতচল্লিশ।

সামনে সোজাসুজি গেলে বিশাল বিল পড়ে। ডাইনে কাশবন ভেঙে কোনাকুনি চললুম। উঁচু সড়কে উঠতে হবে। তারপর বাস লরি যাহোক কিছু পেয়ে যাব। বাবুগঞ্জে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে নিশ্চিন্ত।

রাঢ় অঞ্চলের ওইসব বিশাল মাঠ বা বিলে গ্রীষ্মের দুপুরগুলো

কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, অভিজ্ঞতা না থাকলে অনুমান করা কঠিন। উত্তেজনা আস্তে আস্তে কমে আসায় ক্রমশ রোদের তাপ বেড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। গলা শুকিয়ে খসখস করছিল। কাছাকাছি কোথাও জল নেই। ফোস্কা পড়ে যাচ্ছিল শরীরের খোলা জায়গাগুলোয়। টলতে টলতে এগোচ্ছিলুম। মনে হচ্ছিল, ওই সড়কটায় পৌঁছনোর আগেই হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাব।

কিন্তু লাইলি এতে অভ্যস্ত। সে বেশ হনহন করে হেঁটে চলেছে। এখন কাশখড় কাটার মরশুম। অথচ রোদের ভয়ে সব খড়কাটারাই পালিয়েছে। এখানে ওখানে কাটা খড় পড়ে রয়েছে। খড় বয়ে নেওয়ার জন্যে যে গাড়িগুলো আসে, তাদের চাকার চাপে দুফালি টানা পথ তৈরি হয়ে গেছে। একফালি দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি। সড়ক তখনও আন্দাজ কোয়াটার মাইল দূরে। সামনে একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখতে পেলুম। অমনি আর নিজেকে থামিয়ে রাখা গেল না। বললুম—'লাইলি। একমিনিট।'

লাইলি দাঁড়াল। ঘুরে সপ্রশ্ন তাকাল।

'এখানে এসো। একটু বসা যাক্।'

সে একটু হেসে ধুপ করে বসে পড়ল শুকনো ঘাসের ওপর। আমি তার বেশ খানিকটা তফাতে বসলুম। তারপর এতক্ষণে সিগ্রেট ধরালুম। দেশলাই কাঠিটা সাবধানে ঘষে নিবিয়ে দিলুম। কারণ আগুন ধরে গেলে আমরা আর বেরোতে পারব না। জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে। খড় ও ঘাসের জঙ্গল শুকিয়ে বারুদের মতো হয়ে আছে।

হুহু বাতাস বইছিল। লাইলি পাদুটো ছড়িয়ে পাশ ফিরে বসেছে। তার মুখটা এখন কালো হয়ে পড়েছে। তার পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলুম। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। যে রক্ত দেখলে একটু আগে আরও খুন চড়ে যেত মাথায়, এখন তা মনে কষ্ট আনল। আহা বেচারা। বললুম—'জুতো পরোনি কেন?'

লাইলি জবাব দিল না। ঠোঁট শুকিয়ে রয়েছে। জিভ দিয়ে একবার চাটল।

ফের বললুম—'রিভালবারটা ফেলে দিলে কেন?'

এবার সে একটু হাসল। ...'ধরা দেব বলে!'

'ধরা দেবে বলে? চালাকি করে কোন লাভ নেই, লাইলি। তোমার মতো মেয়ে ক্রিমিনাল আমি কম দেখিনি। সত্যি জবাব দাও তো, কেন...'

সে বাধা দিয়ে বলল—'কী বললেন? মেয়ে ক্রিমিনাল?'

'হ্যাঁ!'

'কে ক্রিমিনাল? আমি?'

'ওকথা থাক। আমি যা জানতে চেয়েছি, তার জবাব দাও।'

'তার আগে আপনি বলুন না, কেন আমি ক্রিমিনাল?'

'সে জবাব দেবে কোর্ট। সরকার।'

'উঁহু! তারা কে? আপনি আমাকে কেন এ্যারেস্ট করতে এসেছিলেন?'

'শুধু এ্যারেস্ট নয়—মেরে ফেলতেও।'

'আমি—আমরা সবই জানি আনুদা। কিন্তু আপনার কী লাভ এতে?'

'আমি...'হঠাৎ থেমে গেলুম। এর জবাবে নিজেকে চাকর বলতে হয়। কিন্তু এখন তা ভাবতে কেন যেন তেঁতো লাগল; তাই বললুম—'বাজে কথার সময় নেই। তুমি রিভলবারটা ফেলে দিলে কেন?'

'বলেছি তো। ধরা দিতে চাইলুম, তাই।'

'হঠাৎ তোমার এমন সুমতি হয়ে গেল কেন লাইলি?'

'বললে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?'

'আগে বলো, তারপর বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসবে।'

একটু চুপ করে থেকে সে বলল—'যদি বলি—আপনাকে ওরা মেরে ফেলবে বলে আমার কষ্ট হয়েছিল ?'

খাপ্পা হয়ে বললুম—'শাট আপ মিথ্যুক কোথাকার !'

লাইলি একইভাবে বলল—'বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে। বীরুদার ষড়যন্ত্র আমি মনে মনে মেনে নিতে পারিনি। অথচ আমার কোন উপায় ছিল না। যখন পরপর তিনবার গুলির শব্দ শুনলুম, রাগে দুঃখে আমি পাগল হয়ে গেলুম! আম্নুদা না হয়ে অন্য কেউ হলে নিশ্চয় অমন হত না।'

ব্যঙ্গ করে বললুম—'তোমার ছেনালির অন্ত নেই, লাইলি !'

লাইলি মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলল—'যা খুসি বলতে পারেন ! আমি যা করি যা বলি স্ট্রেট কাট। কোন ঘোর প্যাঁচ জানিনে।' একটু থেমে সে ফের বলল—'আসলে এতদিন আমার হাঁফ ধরে গিয়েছিল ! আমি এদের হাত থেকে পালানোর সুযোগ খুঁজছিলুম !'

'বাঃ, চমৎকার। বলে যাও।'

'চলে আমি যেতুমই। হয়তো ধরাও দিতুম। দিনের পর দিন রাতের পর রাত অমন করে লুকিয়ে বেড়ানো আর আমার সইছিল না। আপনি এসেছেন শুনে একটা প্লানও এল মাথায়। কিন্তু পরে বীরুদারা খোজখবর নিয়ে জানল আপনি কেন এসেছেন। তখন আমার ভীষণ দুঃখ হল।'

'থেমোনা। বেশ লাগছে শুনতে।'

'আপনাকে ওরা ফাঁদে ফেলতে চাইল। আমি আটকাতে পারিনি। কারণ, আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রোপোজাল দিয়েছিলুম বীরুদাকে। প্ল্যানমতো কিন্তু আজ যখন পরপর তিনবার গুলির শব্দ কানে এল, ভাবলুম—যাঃ! দুনিয়ায় অন্তত একজন মানুষ আমাকে ফিল করতে পারত, সেও রইল না। তারপর রিভলবারটা ঝোঁকের মাথায় ফেলে দিলুম। বীরুদাকে আমার ঘেন্না হচ্ছিল।'

কাটাকাটাভাবে কথাগুলো বলছিল সে। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। নিশ্চয় আমার দুর্বল অনুভূতিতে আঙুল ছুঁয়ে দিয়েছে সে—আমি বিব্রত হয়ে পড়ছিলুম। কিন্তু ওকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। লাইলি নিপুণ অভিনয় করতে পারে জানি। তাই হো হো করে হেসে তার কথাগুলো উড়িয়ে দিতে চাইলুম।

'আনুদা, আমি কিছু ভুলি না—ভুলিনি। আজ আপনি হাসছেন কিন্তু...'

তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালুম। দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'ওঠ! ওসব মহাভারত শুনে কোন লাভ নেই।'

লাইলি উঠে দাঁড়াল না। বলল—'বুঝতে পারছি, আপনি বদলে গেছেন। অথচ একদিন পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার পা চুষে দিয়েছিলেন!'

গর্জে উঠলুম—'শাট আপ! ওঠ বলছি। কুইক!'

'আপনি এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছেন আনুদা! আশ্চর্য, আমার বিশ্বাস ছিল আমার সব কথা শুনলে আপনিই আমাকে ফিল করতে পারবেন!'

'একটি কথা নয় আর। ওঠ—কুইক!'

'আনুদা, আপনার কিছু মনে পড়েনা?'

এবার ওর ব্লাউসটা কাঁধের কাছে খামচে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করলুম। ও নেতিয়ে পড়ে গেল। ঠোঁট কামড়ে বলল—'জোর করলে জ্যান্ত তুলে নিয়ে যেতে পারবেন না। ছাড়ুন।'

ছেড়ে দিয়ে বললুম—'বেশ। ওঠ।'

লাইলি উঠল না। পড়ে রইল শুকনো ঘাসে। বলল—'আমার খুসি!'

'লাইলি! আমাকে তাহলে কিছুটা অভদ্রতা করতে হবে।'

'করুন না। পুলিশের লোকের বিস্তর অভদ্রতা আমাকে সইতে হয়েছে।'

তার হাত ধরে টানলুম। কিন্তু নড়ানো গেল না। এবার বিপদটা টের পেলুম। একহাতে অটোমেটিক রাইফেল—বেশি টানাটানি—বা ধস্তাধ্বস্তি করলে যে কোন মুহূর্তেই গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ওর মতো হিংস্র ধূর্ত খুনী মেয়ে নাকি ছুটি নেই এদেশে। এ অবস্থায় পড়ে আবার ঘামতে থাকলুম। কোথাও কোন লোক দেখতে পাচ্ছি না যে সাহায্য মিলবে।

ধমক, টানাটানি কোনকিছুতেই কাজ হল না। সবরকম পুলিশী কসরত প্রয়োগেও ও পাথর হয়ে পড়ে রইল। শেষে বলে উঠলুম—'তাহলে তোমাকে মৃত অবস্থায় গ্রেফতার করতে হয়!'

লাইলি চোখ বুজে পড়ে ছিল। সেভাবেই বলল—'বেশ তো। তাই করুন।'

'তাহলে তুমি মরতে চাও?'

'খুসি আপনার।'

পিছিয়ে গিয়ে রাইফেল তাক করে বললুম—'তাহলে মরো। দশ গোনার মধ্যে হয় তুমি উঠে দাঁড়াবে, নয় তো মরবে। এক দুই তিন চার পাঁচ…'

প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছিলুম এই মেয়েটির নার্ভ কত শক্ত, কত নির্বিকার হয়ে উঠতে পারে। ওর ঠোঁটে অদ্ভুত একটা হাসি সমানে জেগে রইল।

'…ছয়…সাত…' মন্থর হয়ে আসছিল গোণা। ভীষণ কাঁপছিলুম। ওর ভিজে মুখের ওপর ভুরুর মধ্যিখানে সাদা কপালটা ছাড়া সবকিছু মুছে আসছিল পরিবেশ থেকে। আর কিছু সহ্য করাও অসম্ভব। যে কোন সময় নিজেই মূর্ছিত হয়ে পড়ব। তিনটে মানুষকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে খুন করতে হয়েছে, নার্ভের চূড়ান্ত অবস্থা চলেছে। এখন ট্রিগারে আঙুলের সামান্য চাপই যথেষ্ট।

'…আট…নয়…'

একটু সময় নিলুম। 'দশ' বলতে গিয়ে টের পেলুম গলায় স্বর নেই। তারপরই মাথাটা ভীষণ ঘুরে গেল। ঝলসানো ধুসর কাশকুশের জঙ্গল পাক খেতে শুরু করল। বুকের ভেতর খিল ধরে আচমকা দম আটকে যাচ্ছে মনে হল। অমনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলুম। সানস্ট্রোকের লক্ষণ নয় তো?

তখন টলতে টলতে গাছের ছোট্ট ছায়াটুকুতে গিয়ে দাঁড়ালুম। ভীষণ দুর্বলতায় শরীর থরথর করে কাঁপছে। তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। লাইলির মাথার কাছে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলুম। লাইলি তখনও চোখ খোলেনি। এবার বলে উঠল—'কী হল আনুদা?'

ক্ষেপে গিয়ে ওর পিঠে জুতোসুদ্ধ লাথি মারলুম। ও তক্ষুনি অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠে বসল। তারপর মুখে তীব্র ঘৃণা অথবা বিদ্রূপ রেখে বাঁকা ঠোঁটে বলল—'বাঃ! বাহাদুর! মনিবরা চমৎকার শিখিয়েছে কুকুরকে!'

কুকুর! ইচ্ছে হল, ওর দাঁতগুলো রাইফেলের কুঁদো মেরে ভেঙে ফেলি। কিংবা ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরোটুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি ওর দেহটা। গুলি করে মারলে তো টেরও পাবেনা আমার এই ভীষণ ঘৃণা আর দুঃখ, দুঃখ আর অভিমান!

দুঃখ আর অভিমান! চমকে উঠলুম নিজের দিকে তাকিয়ে। এই মেয়েটিকে আঘাত করেও গভীর যন্ত্রণা সইতে হবে, আবার ওকে রেহাই দিলেও অনুতাপে অনুশোচনায় ছটফট করে জ্বলতে হবে—কারণ, কর্তব্যের দায়—স্মৃতি। নিজের এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজেকে কী অসহায় মনে হল!

কোন অবস্থায় মানুষ কোন মানুষকে একটু একটু করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে-কেটে খুন করে, এখন বুঝতে পারছি। এসময় যন্ত্রণা যা সে দেয়, নিজেও তো পায় তার বেশি! একথা আদালত বোঝেনা, কোন তৃতীয় পক্ষ বোঝে না।

লাইলি দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকল। তার পিঠটা ফুলেফুলে উঠছিল। টলতে টলতে ওর কাঁধের কাছে ফের ব্লাউজ খামচে ধরলুম। বললুম—'ন্যাকামি রেখে ওঠ—শিগগির!'

লাইলি ওই অবস্থায় বসে থেকে বলল—'আনুদা, আমার ওপর কিসের এত রাগ আপনার? কিসের গ্রাজ?'

'তোমার ওপর কোন পারসোনাল গ্রাজ নেই। এ আমার ডিউটি—জাস্ট রুটিন ওয়ার্কস। ওঠ!'

'আমি জানি, বীরুদার ওপর কেন হিংসে!'

'লাইলি, রাগ চড়িও না।'

'নিজের মনকে জিগ্যেস করুন!'

'করেছি।'

'কিন্তু কেন আমি এমন হলুম, তা তো ভাবলেন না একবারও!'

'তোমার তত্ত্বকথা আমি শুনতে চাইনে। তুমি ওঠ।'

'চেষ্টা করুন না।'

'দেখ লাইলি, তখন বললে—তুমি ধরা দেবে ঠিক করেছ। অথচ এমন কেন করছ? তোমার যাতে কঠোর শাস্তি না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব—কথা দিচ্ছি। এখন, ওঠ তো!'

খুব শান্ত ভাবে কথাগুলো বললুম। ভাবলুম, এতে কাজ হবে। কিন্তু ও সেই ভঙ্গীতেই বসে রইল। নিশ্চয় এভাবে সময় নিচ্ছে। কোন মতলব আছে মনে—তার জন্যে সময় দরকার হচ্ছে সম্ভবত।

এবার আমি পাগলের মতো উদ্ভট কাণ্ড শুরু করলুম। ওর পাঁজরে কাতুকুতু দিলুম। চুল ধরে প্রচণ্ড টানলুম। ওর শরীর কি নিঃসাড়? একটুও নড়ল না। তখন মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেল।

রাইফেলটা সাবধানে কিছু তফাতে রেখে ওর শাড়ির আঁচলটা ধরে ফেললুম। তারপর যথাশক্তি শাড়িটা খুলে ফেলার চেষ্টা করলুম। এতে বাধা দিল না। শুধু বলল—'এতক্ষণ বললেই তো হত উদ্দেশ্যটা কী?'

বুঝলুম কী বলতে চাইছে। শাড়িটা পুরো খুলে নিয়ে বললুম—'আমি বীরুর মতো জন্তু নই যে বনে বাদাড়ে মেয়ে নিয়ে কামকেলি করব।'

লাইলি সায়া ও ব্লাউস পরে বসে রয়েছে এখন। তার চোখে চমক লক্ষ্য করলুম। তার ভুরুর কুঞ্চনে একটা প্রশ্ন থর থর করে কাঁপছিল।

বললুম—'গতকাল সকাল থেকে দুপুর অব্দি ওই জঙ্গলে তোমাদের দুজনকে ফলো করেছিলুম। ইচ্ছে করলেই তোমাদের গ্রেফতার করতে পারতুম—করিনি। কিন্তু আড়াল থেকে সব দেখেছি। এমন কি ছোট্ট ডোবাটার ধারে যা কিছু করেছ...'

বাধা দিয়ে লাইলি ব্যঙ্গ করল—'খুবই স্বাভাবিক আপনার পক্ষে। ফেউরা তাই করে। বাঘের এঁটো মড়া ওদের ভীষণ মুখরোচক কিনা।'

কোন কথা বললুম না। আমি প্ল্যানটা কাজে লাগানোর কথাই ভাবছিলুম।

'তাহলে আর দেরি কেন? আসুন—বাঘটা তো এখন নেই! ভয় কিসের? কেউ হামলা করবে না।' বলেই লাইলি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে সায়ার ফাঁসটা একটানে ঢিলে করে সায়াটা নামালো।

হাঁটু অব্দি নেমেছে, তখন আমি তার গালে একটা চড় মারলুম। আঙুল বোধ হয় দাঁতে লাগল। ওর ঠোঁটটাও কেটে গেল। তারপর চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টানে গাছের গুঁড়ির কাছে নিয়ে এলুম ওকে। তারপর শাড়িটা দিয়ে ওকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেললুম। ও বাধা দিল না।

ওর মুখের দিকেও আমি তাকাচ্ছিলুম না। খুব শক্ত করে বাঁধার পর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আটকালুম। গুঁড়ির পিছনে এমন জায়গায় গেরোটা রাখলুম, যেখানে কোনভাবেই ওর হাত পৌঁছবেনা।

ওর শ্বাসকষ্ট যাতে না হয়, বুকের দিকটা ঢিলে করে দিলুম। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে একটু তফাতে এসে সিগ্রেট ধরালুম।

সিগ্রেট টানবার সময় আড়চোখে ওর মুখটা দেখে নিচ্ছিলুম। ঠোঁটের বাঁপাশে রক্ত জ্বলজ্বল করছে। মুখ নামিয়ে ও বসে রয়েছে একটি প্রাণীর মতো। সুন্দর একটি বন্য প্রাণীর মতো।

এবং সেই সময় আচমকা আমার মনে পড়ে গেল বীরেশ্বরের কাছে শোনা ওর আগের জীবনের একটি দিনের কাহিনী—যেদিন তাকে গাঁয়ের লোকেরা মারতে মারতে চুল কেটে বের করে দিয়েছিল রাস্তায়। ওই সেই রাস্তাটা দূরের ব্রিজ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে, দুধারে উঁচু শিরীষ অর্জুন আকাশিয়ার পাঁচিল। ওই গাছগুলো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে অবিশ্বাস্যভাবে।…

কেন হঠাৎ অত ভয় পেয়ে গেলুম, বলতে পারবনা। রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে সতর্ক চোখে চারপাশে তাকালুম। তারপর প্রায় দৌড়ে পালাতে থাকলুম। কয়েক একর কাশকুশ ও মাঝেমাঝে শূন্য রবিশস্যের ক্ষেত, তারপর টানা গুল্মজাতীয় কাঁটাঝোপের থুপি ছড়ানো উঁচুনিচু মাঠ, তারপর পাকা রাস্তা।

ছুটির নেশা, কিংবা তাড়াখাওয়া প্রাণীর ব্যস্ততা আমাকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা লরি থামাতে চেষ্টা করলুম। থামল না সেটা। হাতে মরণাস্ত্র দেখেই বুঝি ভয় পেয়ে গেল ড্রাইভার। বাঁদিকের চাকা নিচে নামিয়ে প্রচণ্ড জোরে পাশ কাটিয়ে গেল আমাকে।

আবার একটা লরি এল। গতি কমাল। কিন্তু দাঁড়াল না। চেঁচিয়ে বললুম—'বাবুগঞ্জ যাবো, বাবুগঞ্জ!' আমার মুখে ধুলো খড়কুটো ছুড়ে দিয়ে চলে গেল লরিটা।

এবার এল একটা জিপ। তখন আমি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করে রইলুম। জিপটা ব্রেক কষে অন্তত বিশ মিটার তফাতে দাঁড়িয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা ভয়

পাওয়া সাদা লালনাল পুতুলের মতো মানুষ দেখতে পেলুম। বললুম—'ক্ষমা করবেন! আমি ডাকাত নই। প্লীজ, আমাকে বাবুগঞ্জ পৌঁছে দিন!'

ড্রাইভারের পাশে যে তুম্বোমুখো মোটা ভদ্রলোক বসেছিলেন, বললেন—'কে আপনি? কী ব্যাপার?'

'পরে শুনবেন।'

জিপটা বাবুগঞ্জ ব্লক অফিসের। লোকগুলো আর কোন প্রশ্ন করল না। পরস্পরের দিকে একবার তাকাতাকি করে নিল। কিছু বলার আগেই আমি লাফ দিয়ে ড্রাইভারের দিকে ঠেলে উঠলুম। জিপটা চলতে থাকল।

কিন্তু প্রত্যেকে ভয় পেয়ে গিয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছিল না ওরা। একটু পরেই ব্রিজে পৌঁছে গেলুম। আড়াল হবার জন্যে ঝুঁকে বসলুম। কিন্তু চোখ রইল তাঁবুটার দিকে।

তাঁবুর বাইরে কোন লোক নেই। পেরিয়ে যেতে যেতে তাঁবুর ভেতরটাও নজরে পড়ল। কেউ নেই। বীরেশ্বর কি টের পেয়েছে ইতিমধ্যে? কোথায় গেল সে? জিপ যত এগোল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলুম সামনে—তাকে কোথাও দেখতে পেলুম না।

দেখতে দেখতে রাণীহাট পেরিয়ে গেল জিপ। তারপর যখন বাবুগঞ্জে ঢুকল, জিপের লোকগুলো আচমকা জ্যান্ত হয়ে উঠল এতক্ষণে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে থাকল। জবাবে শুধু বললুম—'আগে থানায় পৌঁছে দিন—প্লীজ!'

অবশ্য একথা বলার দরকার ছিল না। কারণ চতুর ড্রাইভার সোজা থানায় গিয়ে উঠারই মতলব ভেঁজেছিল।...

গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুমোলে একধরণের স্বপ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

ভারি অদ্ভুত সব স্বপ্ন। দেখছিলুম, বিশাল এক কাশবন পেরিয়ে যাচ্ছি আমি আর লাইলি। তার সঙ্গে ভীষণ ভালবাসার খেলা চলেছে। হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল চারপাশে। লাইলি হাসতে হাসতে আগুনের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে, আমি অসহায় হয়ে তাকে ডাকছি—কিছুতেই আমার কথা শুনছেনা। কী যে কষ্ট হচ্ছে! আমার একটা কান পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।···

ঘুম ভাঙল ও সি মিঃ দত্তের ডাকে। জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে মুখে পড়ছিল। পর্দাটা রড়ে লেপটে রয়েছে। গলা শুকনো কাঠ। পাশের টুল থেকে গ্লাসটা নিয়ে আগে জল খেলুম। দত্ত একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তিনি কাঁচুমাচু হাসলেন।—'একটু বিরক্ত করতে বাধ্য হলুম, স্যার। দা ব্যাড নিউজ!'

'কিসের?' বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

'মুখার্জি ফিরে এসেছে। সেই গাছটার নিচে কাকেও দেখতে পায়নি! চারপাশে খুব খোঁজা হয়েছে—নো ট্রেস!'

'হোয়াট?' উঠে দাঁড়ালুম। মনে পড়ে গিয়েছিল সবটা।

'হ্যাঁ স্যার, লাইলি নিজেই বাঁধন খুলে পালিয়েছে কিংবা কেউ তাকে সাহায্য করেছে। হেমন্তবাবুরা এখনও ওখানে এনকোয়ারি করছেন। অদ্ভুত ব্যাপার স্যার, ওসময় কোন লোক কাছাকাছি কোথাও ছিল না! অথচ···'

'বীরেশ্বরের খবর কী?'

'সে হাওয়া। ওর বাড়িতে আমাদের লোক রয়েছে এখনও।'

'ব্রিজের তাঁবুটা?'

'নেই। ফাঁকা সব।'

আমি কি খুব রেগে গেলুম, নাকি খুসি হলুম? বোঝা যাচ্ছিল না। হেরে যাওয়ার কষ্ট, নাকি মুক্তির সুখ আমাকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়ে রাখল, কে জানে। সিগ্রেট টানতে থাকলুম নিঃশব্দে। স্বপ্নের দৃশ্যটা ভাবছিলুম।

এসময় মুখার্জি এসে গেল। স্যালুট ঠুকে একটু তফাতে দাঁড়াল। বেচারার মুখটা রোদে কালো হয়ে গেছে।

বললুম—'গর্তের লাসগুলো দেখেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। তিনটেই ছিল—ডেড! এম্বুলেন্স গেছে আনতে।'

একটু হেসে মিঃ দত্তের দিকে ঘুরে বললুম—'তাহলে ব্যাপারটা এবার ম্যানেজ করুন মিঃ দত্ত। দেখবেন, পলিটিকস এসে না জোটে।'

মিঃ দত্ত হাসলেন। 'সব ঠিক আছে স্যার। তিনটেই কুখ্যাত এবং ফেরারী আসামী। আমাদের রিপোর্টে থাকছে, একটা স্কোয়াড বেরিয়েছিল ওই এলাকায়—মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। সদরে মেসেজ পাঠানো হয়েছে অলরেডি। ভাববেন না।'

মুখার্জি বলল—'পলিটিকাল পার্টিগুলো এতে খুসিই হবে। লাইলির দলের বিরুদ্ধে ওদের প্রচণ্ড গ্রাজ আছে। ভাববেন না—শহীদ বলে কোন শোক মিছিল বেরোচ্ছেনা!'

ওরা দুজনে হাসতে লাগল। বললুম—'যাই হোক, বোকামি একটু হয়ে গেছে আমার। সেটা স্বীকার করা ভালো। আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গেলেই এটা ঘটত না। আসলে লাইলিদের অর্গানাইজেশ্যানাল দিকটা এত শক্ত হতে পারে ভাবিই নি! ঠিক আছে—একটু ভেবে নিই।'

এটা মিঃ দত্তের কোয়ার্টার। 'চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, স্যার।' বলে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। মুখার্জি স্যালুট করে বেরিয়ে গেল অফিসের দিকে।

ভাবতে বসে দেখলুম, মগজ প্রচণ্ড খালি। কী-ই বা করার আছে এখন? আর শত চেষ্টাতেও লাইলিকে কি খুঁজে বের করা যাবে, নাকি কোন যোগাযোগ করার পথ রইল? বুদ্ধির দোষে, জেদে এবং গভীর দুর্বলতায় মুখোমুখি লড়াই দিতে গিয়েছিলুম, তাই হার মানতে হল।

এ হার গোয়েন্দা অফিসার আন্নু চৌধুরীর অফিসিয়াল হার নয়—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। হয়তো এই হার তার বাকি জীবনের সবকিছু নিষ্ফল করে ফেলবে।

শূন্যদৃষ্টে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালুম। আমি ব্যর্থ। আর কিছু করার নেই—অন্তত আমি আর কোন কাজেই লাগব না।

এ্যাসট্রে থাকা সত্বেও সিগ্রেটটা মেঝেয় ঘষে নিভিয়ে দিলুম। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। শিমুলিয়া গিয়ে ব্যাগটা নিতে হবে। তারপর···

তারপর জেলার সদরে গিয়ে একটা রিপোর্ট দিয়ে রাতের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাব।

উঠে জানলার কাছে গেলুম। পর্দা সরিয়ে দেখি থানার পিছনের আমবাগানে বিকেলের রোদ শুকনো ঘাসে শান্তভাবে শুয়ে রয়েছে। কিছু ছাতারে পাখি শুকনো পাতা খুঁটে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতিজগত আশ্চর্য নির্বিকার। কোন ছাপ পড়েনি ঘৃণা, দুঃখ, হিংসা, ঈর্ষা, রক্ত, কান্না কিংবা গভীরতর গোপন প্রেমের। অথচ স্মৃতি একটা হালকা রঙীন প্রজাপতির মতো সব কিছু ছুঁয়ে আবার উড়তে শুরু করছে। এবং সেই সময় হঠাৎ ভেসে এল সেই কাঠ মল্লিকা ফুলের গন্ধ। সচকিত হয়ে উঠলুম। সবটুকু চেতনা জরজর হয়ে পড়ল তীব্র গন্ধের ঝাঁঝে।

'চা!'

ঘুরে, দেখি, দত্তের মেয়ে চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছে। ঠোঁটে হাসি।

'শোন—তোমাদের এখানে কাঠমল্লিকা ফুলের গাছ আছে নাকি?'

মেয়েটি অবাক চোখে বলল—'হ্যাঁ। ওই তো—কুয়োতলার পাশে।'

'ও।' বলে আমি চুপ করে গেলুম। এখন—এই মুহূর্তেই

শিমুলিয়ার সেই পীরের মাজারে ভাঙা ইটের কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে শান্ত হওয়া যেত। সেই স্নেহময় পবিত্র প্রাচীন গাছ কি এখনও বেঁচে আছেন? কিন্তু প্রকাশ্য দিনের আলোয় এই এলাকার কোথাও একা নিরস্ত্র বেরোবার সাহস আর আমার নেই।...

শিমুলিয়ায় আমার সত্যিকার পরিচয় কেউ জানে না। কিন্তু ভয় ছিল, যদি লাইলিদের দলের কেউ থাকে ওখানে, তাহলে আমার বিপদ ঘটতে পারে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে বেশি রাতে যাওয়াই ঠিক করেছিলুম।

তখন রাত বারোটা। কৃষ্ণপক্ষ চলেছে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আমাদের জিপ কাঁচা রাস্তা ভেঙে গ্রামে ঢুকল। একখানে বিশাল বটগাছ আছে। তার তলায় জিপটা আমার অপেক্ষায় রইল। আমি সাবধানে নেমে গেলুম। ফৈজুচাচার বাড়ি খুব কাছেই। কিন্তু টর্চ জ্বালতেও সাহস হল না। যে ভাবে হেঁটে গেলুম, গ্রামের লোকে আমাকে চোর ভাবতে পারত।

ফৈজুচাচা বারান্দায় খাটিয়া পেতে শুয়েছিল। ঘুমোয় নি। আমার চাপাগলায় ডাক শুনে লাফিয়ে উঠে বলল, 'বেটা আনোয়ার! এস, এস! তোমার জন্যে বড্ড ভাবছিলুম বেটা!'

চাপা স্বরে বললুম—'আস্তে! চাচা, আমি চলে যাচ্ছি। ব্যাগটা নিতে এলুম।'

আলোর দম বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল ফৈজুচাচা, এবার থেমে অবাক হয়ে তাকাল।...'কেন, কেন বেটা?'

'তেমন কিছু না। ব্যাগটা এনে দাও শিগগির!'

ফৈজুচাচা উঠে দাঁড়াল। সে যে ভীষণ অবাক হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। তা বোঝা যাচ্ছিল। লণ্ঠন হাতে সে বাড়ির ভেতর ঢুকল।

প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত হবার আতঙ্কে অস্থির থাকলুম, যতক্ষণ না সে ফিরে এল।

ব্যাগটা দিয়ে ফৈজুচাচা চাপা গলায় বলল—'বেটা, আজ জঙ্গলে নাকি পুলিশের সঙ্গে ডাকাতদের দাঙ্গা হয়েছে—তিনটে খুন হয়েছে। এসবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়োনি তো?'

'না, না। ওসবে কেন জড়াতে যাব?'

'কী জানি বাবা, দিনকাল খারাপ।' ফৈজুচাচা সংশয়ান্বিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

'তাহলে আসি চাচা। আবার দেখা হবে।'

বুড়ো আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর চোখ মুছে বলল—'যদিন বাঁচি, খবরাখবর দিও। আর এসো মধ্যেমধ্যে।'

লাইলির কথা তুলতে ইচ্ছে করছিল—বুড়োর প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে। কিন্তু হাতে সময় কম।

পা বাড়াচ্ছি, সেই সময় ফৈজুচাচা হঠাৎ ডাকল—'আনু, শোন।' ঘুরে দাঁড়ালুম। সে আমার মুখ অব্দি মিটমিটে কালিপড়া লণ্ঠনটা তুলে অদ্ভুত দৃষ্টে তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল—'আমার মনে ধাঁধা রয়ে গেল বেটা। আজ জঙ্গলে ওই খুনখারাবি হল, আর তুমি এমনি করে রাতবিরেতে হঠাৎ এসে চলে যাচ্ছ। ইদিকে আজ সন্ধেবেলা তোফাজেল জিগ্যেস করছিল তোমার কথা—ফিরেছে কি না। তোফাজেল তো চোরডাকাত লোক। তাতে রাণীহাটের বীরুবাবুর লোক। আমার কেমন গা বাজে বেটা। কিছু বিপদ বাধাওনি তো?'

তোফাজেল প্রসঙ্গ চমকে দিয়েছিল। কিন্তু বুড়োর কথায় পাত্তা না দিয়ে বললুম—'না না, তুমি ভেবোনা চাচা! ওসবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি এমনিই চলে যাচ্ছি।'

বাইরে দূরে কথাও কুকুর ডাকল। বুড়ো লণ্ঠনটা বারান্দা থেকে রাস্তার দিকে ঝুঁকিয়ে কিছু দেখে নিয়ে বলল—'বেটা আনু,

তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। সাবধান করা দরকার ছিল। তল্লাটে এখন ভেতর-ভেতর বড্ড অশান্তি চলেছে।'

প্রশ্ন করলুম—'কিসের অশান্তি?'

'স্বদেশীবাবুদের সঙ্গে জমিজিরেতওলা জোতদার বড়লোকের গণ্ডগোল চলছে। বীরুবাবু লুকিয়ে স্বদেশী করে কি না! তল্লাটের বড়লোকেরা ওকে খুন করার তালে আছে। তাই সবসময় বন্দুক-হাতে ঘোরে। তোমাকে বলেনি বীরু?'

'না তো।'

'তুমি বীরুবাবুর কাছে যেতে চাইলে, সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল আগেভাগে। পরে ভাবলুম, ফিরে আসুক ছেলেটা—তখন সব বলব।'

আমি ফের পা বাড়ালুম। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বুড়ো আমার হাত ধরে টানল।...'শোন, শোন। আসল কথাটা তো বলাই হল না। বেটা, ঝুমরি বিবির বেটি লাইলি খাতুনের কথা তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুব আছে।'

বুড়ো এবার কীসব বলবে, জানা—তাই সে শুরু করা মাত্র থামিয়ে দিলাম।...'শুনেছি। বীরু সব বলছিল। সে তো সাংঘাতিক মেয়ে হয়ে উঠেছে।'

বুড়ো ফিসফিস করে বলল—'আমার নাতনী দুপুরবেলা এল হরিণমারা থেকে। এখন তো বিলের দিকটা শুকনো। সোজা বিল পেরিয়ে আসছিল। বললে, বীরুবাবু লাইলি আর জনাতিন লোক বন্দুকপিস্তল নিয়ে উলুখড়ের জঙ্গল পেরিয়ে যাচ্ছিল। নাতনীর সঙ্গে ছিল দুটো বাচ্চা। ওরা সবাই মিলে নালায় পানি খেতে নেমেছিল। তখন সামনাসামনি বীরুবাবুরা এসে পড়ে। তারপর খুব শাসিয়ে বলেছে—ওনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে একথা কাকেও বললে খুন করবে, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

নাতনী তো ভয়ে সারা। বেটা আনু, এ কী দিনকাল পড়ল ভেবে পাই না।'

উত্তেজনা চেপে বললুম—'তাই নাকি? কোথায় যাচ্ছিল ওরা?'

'সড়কে উঠে নাতনী দেখে বীরুবাবুরা বকখালির দিকে যাচ্ছেন। বকখালি সেই শাঁখালা বিলের ধারে—বেশ বড় গেরাম। বাবু ভদ্রলোকের বাস আছে। হয়তো ডাকাতি গুণ্ডামি করতে গেল শয়তানগুলো।'...বলে বুড়ো আফশোসে মাথা দোলাতে থাকল।

বকখালি! মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শিমুলিয়া থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মাইল চারেক দূরত্ব বড় জোর। একটা কাঁচা সড়ক এখান থেকে চলে গেছে গ্রামের ভিতর দিয়ে। বকখালি থেকে সোজা মাইল পনের এগোলে পড়বে নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথ। একটা মাঝারি ধরণের ষ্টেশন মোহনপুরে কাঁচা সড়কটা শেষ হয়েছে। অবশ্য এখন কাঁচা সড়কটার নিশ্চয় পাকা হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমার উত্তেজনা বেড়ে গেল। বকখালিতে আমার বাবার এক কম্পাউণ্ডার শ্রীনাথবাবু ছিলেন। তাঁর ছেলে রবীন আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। কারণ তখন শ্রীনাথবাবু শিমুলিয়াতেই থাকতেন। আমরা কলকাতা যাবার পর নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে তিনি ডাক্তারী করতেন শুনেছিলুম।

শান্তভাবে বললুম—'বকখালি! আচ্ছা চাচা, বকখালির সেই শ্রীনাথবাবু কম্পাউণ্ডার এখনও বেঁচে আছেন নাকি?'

ফৈজু-বুড়ো বলল—'না। তিনি কবে মারা গেছেন।'

'তাঁর ছেলে রবীনের খবর জানো?'

'রবীনবাবুই তো এখন ডাক্তার হয়েছেন গো! খুব বড় ডাক্তার। অনেক পাস দিয়েছেন। তার ওপর অঞ্চলপ্রধান তো তিনিই। গাঁয়ের কী উন্নতি করেছেন, চোখে না দেখলে বুঝতে পারবে না। বিজলী আলো এসেছে বকখালিতে। এখনই গিয়ে দীঘির পাড়ে দাঁড়াও না। দেখবে আলো জুগজুগ করছে। ভেলকি লাগিয়ে

দিয়েছেন একেবারে। আমাদের কপাল, শিমুলিয়া যা ছিল, তারও কম হয়ে গেল। তোমরা চলে না গেলে কি গাঁয়ের এ হাল হয় বাবা ?'

আবার কোথায় কুকুর ডাকল। তারপর চৌকিদারের গলা শোনা গেল—'হেই ! জা—আ—আ—গো—ও—ও—ও !'

আর দাঁড়ালুম না। বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। কোন রকমে ওকে আশ্বস্ত করে রাস্তায় নামলুম।

হুঁ, বীরুর চর তোফাজেল আমার খোঁজ করেছিল। এটা স্বাভাবিক। ব্যাগটা খুলে আগে রিভালবারটা দেখে নিলুম। ঠিক আছে। ফৈজুচাচা এসব ব্যাপারে খুবই নির্ভরযোগ্য মানুষ। আনোয়ারের শহুরে বস্তুতে জান গেলেও কাকে হাত ছোঁয়াতে দেবে না, জানি।

বটতলায় এসে দেখি লণ্ঠনহাতে চৌকিদার মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছে। চৌকিদারকে আমি চিনি—সেও চেনে আমাকে। তবে ডাক্তারের ছেলে বলেই তাই সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তখন মুখার্জি বলল—'নবীন, তোমায় জানিয়ে রাখলুম—সায়েব আমাদেরই লোক। কেমন ?'

নবীন চৌকিদার মাথা নাড়ল। তারপর সেলাম ঠুকে বলল—'হুজুর আমাদের তিনপুরুষের মা বাপ।'

আমাদের জিপ চলতে শুরু করল।···

পাকারাস্তায় পৌঁছে বললুম—'একমিনিট মুখার্জি। গাড়ি থামান।'

মুখার্জিই জিপ চালিয়ে এনেছিল। দাঁড় করাল রাস্তার এক পাশে। রাতের দিকে রাস্তায় লরি চলাচল বেশি হয়। সে বলল—'খবর আছে, স্যার। আপনি না বললেও দাঁড় করাতুম।'

'খবর আমারও আছে মুখার্জি। এখন আমি প্ল্যান বদলেছি। ষ্টেশনে যাচ্ছি না—অর্থাৎ কলকাতা ফিরছিনা।'

'খুব আনন্দের কথা, স্যার।'

'বকখালি যাবার রাস্তাটা কেমন বলুন তো ?'

'খুব ভালো পিচের রাস্তা।'

'গাড়ি ঘোরান। আমাকে বকখালি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবেন।'

মুখার্জি একটু ইতস্তত করে বলল—'নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে আপনার। কিন্তু আমার খবরটা মনে হচ্ছে, বেশ জরুরী। চৌকিদার বলল, বীরুবাবু আজ সন্ধ্যায় গাঁয়ে ফিরেছেন।'

'রাণীহাটে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কিভাবে ফিরলেন চোখ এড়িয়ে, বোঝা যাচ্ছে না। ওঁর বাড়িতে তো একটা স্কোয়াড রয়েছে। যাই হোক, একবার দেখে আসা দরকার এখুনি।'

একটু ভেবে নিয়ে বললুম—'দেখুন, আমার দরকার লাইলিকে, বীরুর ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু আমার এখনই একটা গাড়ি দরকার। সম্ভব না হলে বরং পায়ে হেঁটে যেতেই হবে। অন্তত একজন লোক সঙ্গে পেলে ভাল হত।'

মুখার্জি বলল—'ভুল হয়ে গেছে। ড্রাইভারকে সঙ্গে আনলে গাড়িটা দেওয়া যেত। আপনাকে পৌঁছে দিত। কিন্তু আমাকে স্যার রাণীহাট এখনই না গেলে নয়। আজ রাতেই ডি এস পি সায়েব এসে পড়তে পারেন রাণীহাটে। আমাকে সেজন্যেও এ্যাটেণ্ড করতে হবে।'

ডি এস পি রঞ্জন মৈত্রকে আমি চিনি। খুব গোঁয়ার মানুষ। মুখার্জির দ্বিধার কারণ বুঝতে পারছিলুম। তাছাড়া, মৈত্র আমাকেও বিশেষ পাত্তা দেয় না। আলাপ হবার সময় বলেছিল—'কোন প্রাচীন আমলের জানাশুনো কোন কাজে লাগবেনা মশাই। এলাকা এখন হেড টু টেল বদলে গেছে। সুবিধে করতে পারবেন না। এ আউটসাইডারের কাজ নয়।' লোকটি নিশ্চয় স্পষ্টভাষী। কর্তৃপক্ষের সব সিদ্ধান্তই তার কাছে উদ্ভট।

দেরি করা যায় না। বললুম—'ড্রাইভ আমি নিজেও করতে পারি। আপনাকে রাণীহাটে পৌঁছে দিয়ে আমি বকখালি চলে যাব বরং।'...

সাত

রাণীহাট বাসষ্টপে মুখার্জিকে নামিয়ে দিলুম তার কথা মতো। তারপর গাড়ি ঘোরালুম।

ফের শিমুলিয়া হয়ে আসতে হল। কিন্তু একটা অস্বস্তি ক্রমশ জেগে উঠছিল। মুখার্জিকে কয়েক একর জমি পায়ে হেঁটে গাঁয়ে ঢুকতে হবে। তাকে সাবধান করা উচিত ছিল। তার সঙ্গে অবশ্য রিভলবার ও টর্চ আছে। তাহলেও মুখে সাবধান হওয়ার কথা বলা আমার কর্তব্য ছিল।

পরে মনে হল, সে তো একজন ঝানু অফিসার। তাকে সতর্ক হতে বলার কি কিছু দরকার আছে? বিশেষ করে এই এলাকায় সে বেশ করে ক'বছর আছে।

তবু অস্বস্তি গেল না। বারবার মনে হচ্ছিল, তাকে স্কোয়াডের কাছে পৌঁছে দিলেই ভাল করতুম। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই।

মুখার্জির নির্দেশ মতো বাঁদিকে পিচের পথে মোড় নিলুম। দুধারে ফাঁকা শস্যশূন্য মাঠ। রাস্তাটাও ফাঁকা। বিশেষ গাছপালা নেই। শুধু দুধারে ছোট ছোট ঝোপঝাড় রয়েছে। মাইলটাক যাওয়ার পর লম্বা একটা কাঠের ব্রিজ পাওয়া গেল। এখন আমি বিশাল শাঁখালা বিলে চলে এসেছি। দুধারে বাবলাবন দেখা যাচ্ছিল। অনেকদূরে আলো ঝিকমিক করছিল উঁচুতে। বকখালি উঁচু মাঠের ওপর রয়েছে।

ক্রমশ একটা অদ্ভুত ভয় জেগে উঠছিল। এত রাত্রে কাকেই বা রবীনবাবুর বাড়ির কথা জিগ্যেস করব? ঝোঁকের মাথায় এভাবে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। কথা আছে যে সকালে বাবুগঞ্জ থানা

থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। কিন্তু তার আগে গ্রামে একটা তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি হতে পারে। তার ফলেই সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। লাইলি সতর্ক হয়ে উঠবে।

একটা সুবিধে—বকখালিতে কেউ আমাকে চেনে না, রবীন বাদে। তাছাড়া রবীনও এতদিন পরে চিনতে পারবে কিনা অনিশ্চিত। পরিচয় দিলে তখন চিনবে। কিন্তু রবীনকে কি বিশ্বাস করা যাবে?

হঠাৎ মনে পড়ল, ফৈজুচাচা বলেছিল—এলাকার বড়লোকরা বীরুর প্রচণ্ড শত্রু। রবীন অঞ্চলপ্রধান যখন, তাছাড়া ডাক্তারীতে নাম করেছে, তখন সে একজন বড়লোক তাতে ভুল নেই।

আশা জাগল প্রচুর। এখন তার বাড়ি চেনার সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে। ভাবলুম, আজকাল অনেক বেসরকারী লোকও জিপে চড়ে। তাই জিপ দেখলে সরকারী লোক ভাববার কোন কারণ নেই। আমি তো ওষুধ কোম্পানির লোকও হতে পারি। উঁহু—তারা হয়তো জিপে চড়ে ওষুধ বেচতে যায় না।…নাঃ, তাই বা কেন? ধরা যাক্, রবীনের কোন ব্যবসায়ী বন্ধু কোন বিশেষ কাজে এসেছে। ধরা যাক্, ওখানে দোকানটোকান খোলার প্ল্যান নিয়ে এসেছে। অথবা কোন কারখানা গড়তে চায়। ইলেকটিরি আছে যখন, তখন অনেক কিছুই করা যেতে পারে। এইসব অনেক ভাবনাচিন্তা করা গেল। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলুম না। শেষে ঠিক করলুম, এসে যখন পড়েছি, সবরকম রিস্কই নেব।…

বকখালি দুভাগ করে রাস্তাটা চলে গেছে। অবাক হয়ে দেখলুম, এ যে রীতিমতো বাজার! দুধারে লাইটপোস্টে আলো জ্বলছে। সার-সার দোকানপাট রয়েছে—দুএকটা তখনও খোলা। রাস্তায় লোকজনও নজরে পড়ছিল। একপাশে ট্রাক দাঁড় করিয়ে সর্দারজীরা নিচে মদের আসর বসিয়েছে। ঘড়ি দেখলুম—রাত

একটা পাঁচ। ফাঁকায় খাটিয়া পেতে কেউ শুতে যাচ্ছে, কেউ শুয়েও পড়েছে।

মনে হল, কোন কৈফিয়তের দরকার হবে না। জিপের মানুষ এখানে বেশ শস্তা হওয়াই উচিত। মাঝামাঝি এসে গাড়ি দাঁড় করালুম। তারপর নেমে বাঁদিকে একটা পানসিগারেটের দোকানে গেলুম। পানওয়ালা অবাঙালী। এটা আজকাল পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক ব্যাপার। বকখালি অবাঙালী ব্যবসায়ীতে ভরে গেছে আর পাঁচটা বিদ্যুতশোভিত বড় গ্রামের মতনই।

এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনে বললুম—'আচ্ছা দাদু, এখানে রবীনবাবু ডাক্তারের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

পানওয়ালা নির্বিকার জানান—'সিধা যাকে ডাহিনা দেখিয়ে। ফার্মেসি পড়ে গা—বড়া মাকান।'

গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে ডাইনে দৃষ্টি রেখে এগোলুম। ফার্মেসি একটা চোখে পড়ল—কিন্তু একতালা। বড় দালানবাড়ি থাকা চাই। আরও পঞ্চাশ মিটার দূরে আবার একটা নিয়নআলোজ্বলা সাইনবোর্ড দেখা গেল—'সেবা নিকেতন।' দোতলা বাড়ি। একদিকে গেট আছে। গেটে ঘন লতাপাতার ছাউনি। গেটের কাছে গাড়ি রেখে নামের ফলক দেখলুম। মিলেছে!

ডিসপেনসারিটা সামনে, গেট পাশে। সব বন্ধ। গেট দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ভিতরে প্রশস্ত উঠোন আর ফুলের গাছ। দূরে কয়েকটা একতালা ঘর। আমার মাথার ওপর দোতালার ঘরে আলো জ্বলছিল। এদিকে ব্যালকনি রয়েছে। মুখ তুলতেই এক ঝলক টর্চের আলো এসে পড়ল। তারপর ভারি গলায় কে বলল—'কে? কাকে চাই?'

'রবীনবাবুকে।'

'কোত্থেকে আসছেন?'

একটু হেসে বললুম—'কলকাতা থেকে। কিন্তু নিচে না এলে তো কিছু বলা যাচ্ছে না ব্রাদার।'

সংশয়াকুল গলায় প্রশ্ন এল—'নাম কি আপনার ?'

'কী মুশকিল ! আমি কি রবীনবাবুর সঙ্গে কথা বলছি ?'

'আহা, কী দরকার বলুন না।'

'আপনার নামতে কি কষ্ট হচ্ছে ?' ক্ষুব্ধ হয়েই বললুম কথাটা।

'দেখুন, রাতে আমি অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা করিনে। সকালে আসবেন।'

'রবীন, আমি শিমুলিয়ার আনোয়ার।'

'আনোয়ার ? মানে আনু ?' আলোটা আমার মুখের ওপর টানা এক মিনিট পড়ে রইল।

তারপর ব্যালকনি থেকে ওকে হন্তদন্ত সরে যেতে দেখলুম। ভাবা যায় না, সেই রবীনের গলার আওয়াজ এত রাশভারি হয়ে গেছে ! আমার চেয়ে বয়সে বছর দুই বড় হতে পারে। চেহারা যা আবছা দেখলুম, তাতেও মনে হল শরীরকে ভীষণ মোটকা আর গুরুগম্ভীর করে ফেলেছে। পজিশানের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কী হতে পারে ?

গেট খুলে এসে সে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর প্রায় চেঁচামেচি করে বলল—'ওরে শালা ! ওরে বাঞ্চোত ! কোথায় ছিলিস্ এ্যাদ্দিন ? 'বাপরে বাপরে বাপ ! কত যুগ তোকে দেখিনি ! হ্যাঁ রে ভোঁদড়, এখনও মুখ টিপে কথা বলা তুই ছাড়িস নি ! ওরে, আমি যে আকাশ থেকে পড়লুম রে !'

বললুম—'চুপ। তোর পেসেণ্টরা শুনবে।'

'থাম্ রে ! আমি যে কে সেই আছি।' তারপর টানতে টানতে ভেতরে ঢোকাল এবং গেটটায় তালাচাবি আটকে গেল।

বললুম—'আমার গাড়ি রইল যে !'

'হ্যাঁ—তাও তো বটে ! থাম্, ব্যবস্থা হচ্ছে ! মোহান্ত, ওহে মোহান্ত !'

ওদিকের একতালা থেকে কে সাড়া দিল—'স্যার !'

'ঘুমিয়ে পড়োনি তো?' বলেই সে হেসে উঠল। 'ঘুমোলে আর সাড়া দেবে কেন? শোন মোহান্ত, এদিকে এস।'

একটা রোগা পাজামা গেঞ্জিপরা লোক এল।

'ওই গাড়িটা দেখতে পাচ্ছ? আমার বন্ধুর। বুঝেছ? মাই গ্রেট ফ্রেণ্ড! ওর বাবার নাম তুমি শুনে থাকবে। খুব বড় ডাক্তার ছিলেন।...' এ সময় আমি ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পাত্তা দিল না—সমানে বলে যেতে থাকল।... 'ডক্টর চৌধুরী শিমুলিয়ার হে! তাঁর ছেলে। আমার বাবার মনিব ছিলেন ওর বাবা। বুঝলে হে মোহান্ত, আমি ওদের চাকর বংশ!' বলে সে হো হো করে হেসে উঠল!

মোহান্ত দাঁত বের করল।

'এখনই—যাও, জিপটা ভেতরে এনে রাখ।'

মোহান্ত চলে গেল। যতক্ষণ না সে জিপটা ভেতরে ঢোকাল, গ্যারেজের সামনে রাখল, ততক্ষণ তাকে নির্দেশ দিয়ে গেল রবীন,... 'হ্যাঁ—ডাইনে কাটাও, ডাইনে...ব্যস, ব্যস! এবার বাঁয়ে—হ্যাঁ, ব্যস...'

তারপর গেটে নিজে তালা এঁটে আমার হাত ধরল।...'কাম অন আমু। আসলে আজকাল বড় খারাপ দিনকাল পড়েছে ভাই, তাই সবসময় সাবধান থাকতে হয়। প্রায়ই বড় বড় ডাকাতি হচ্ছে। জিপে চড়ে দিন দুপুরেই দোকানে বা গদীতে হামলা করছে ডাকাতরা। শাসনটাশনের বালাই নেই। সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকেছে হে!'

সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উঠে গেলুম। তারপর একটা সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘরে ঢুকে সে বলল—'এভাবে রাতদুপুরে জিপে চেপে কেউ এসে ডাকলে আমার কী অবস্থা হয় জানো না। সবসময় বড় ভয়ে থাকি। বসো, বসো। উঃ, কদ্দিন বাদে দেখা বল তো! তারপর হঠাৎ এভাবে অসময়ে কোত্থেকে? কবে এসেছ?'

সমানে প্রশ্ন করে গেল সে। দেখলুম, রবীন ঠিকই বলেছে—এ বিশবছরে সে একটুও বদলায় নি।…

তেমন কোন কথা রবীনকে বলব না ঠিক করেছিলুম। কিছু কৌশলে ওর প্রতিক্রিয়া জানার দরকার ছিল। বীরেশ্বরের প্রসঙ্গ তোলা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। তুলেই আঁচ করলুম, যা ভেবেছি তাই। রবীন তার ওপর খেপে রয়েছে। কারণ, বীরেশ্বর তলেতলে এলাকার সব জোতদার-বড়লোক এবং সরকারের স্তম্ভগুলো ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্তত রবীনের ধারণা, কাজে করুক বা না করুক, এতেই তাদের চোখের ঘুম কেড়েছে যে! তার ওপর জেলখাটা দুর্ধর্ষ লোক বীরেশ্বর—থাকে একলাষেঁড়ে হয়ে। মেশে শুধু ছোটলোকগুলোর সঙ্গে। ইলেকশান এলে ভোট দিতে বারণ করে সবাইকে। এতে রবীনের রাগ তো হবেই।

এমন কি বীরেশ্বর এলাকার সব ছোট বড় ডাকাতির পিছনে আছে বলেও রবীনের সন্দেহ। বলেছিলুম—'ওকে মিসা বা ভারতরক্ষা আইনে ধরছে না কেন পুলিশ? তোমরাই বা ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করছ না কেন?'

রবীন বলেছিল—'সে চেষ্টা কি হয়নি? আমরা ডি এম কে কতবার বলেছি। এড়িয়ে গেছেন। আসলে এই ডি এম ভদ্রলোক ফ্রেশ ইয়ং ম্যান। ভীষণ লিবার‍্যাল টাইপ। হত যদি সে আমলের ঝাণু আই সি এস, দেখতে কবে বীরুটা কালাপানিতে গিয়ে খাপি খেত!'

অবশ্য কেন বীরেশ্বরকে ধরা হচ্ছে না সে খবর একমাত্র আমিই জানি। লাইলিকে না ধরা অব্দি তার গায়ে হাত দেওয়া হবে না। বীরু যতক্ষণ বাইরে স্বাধীন থাকবে, ততক্ষণ লাইলিকে ধরার চান্স প্রচুর পাওয়া যাবে।

তারপর উঠেছিল লাইলির প্রসঙ্গ। রবীনই তুলেছিল। খুব আচমকা সে আমার ডান বাহু খামচে ধরে বলে উঠেছিল—'আরে আয়ু! তোর সেই ছেলেবেলার লাভার—হ্যাট ভেরি বিউটিফুল মেয়েটির কথা জিগ্যেস করছিস নে তো? ওরে, সে শুনলে তুই ভিরমি খাবি। বাপ রে বাপ রে বাপ। সে এক থ্রিলার। অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর!'

লাইলির কাহিনী তার কাছে ফের শুনতে হয়েছিল। স্বভাবত রবীন কল্পনার রঙটা বেশ চড়িয়েছিল তাতে। লাইলি নাকি চোখের পলকে চেহারা বদলাতে পারে। লাইলির গায়ে জড়ানো থাকে এক অদ্ভুত চীনা যন্ত্র—তার ফলে গুলি লাগে না। ইলেকট্রনিক এই এ্যাপারেটাসগুলো চীন নাকি প্রচুর বানাচ্ছে। এই বর্ম পরে থার্ড গ্রেটওয়্যারে নামবে চীন। তারই দুচারটে ভারতে পাচার হয়ে এসেছে।

কথা বলতে বলতে আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। তারপর শুতে গেল রবীন। ওর বউয়ের সঙ্গে আলাপ হয় নি তখন। ঘুমোচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা।

আলাপ হল সকালে। স্বামীর উল্টো একেবারে। কম কথা বলেন। মনে হল, সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সারাক্ষণ।

আটটায় ডাক্তারখানায় গিয়ে বসে রবীন। সেই ফাঁকে অঞ্চল-অফিসের কাজও সারতে থাকে। অঞ্চল-অফিসটা ওর ডাক্তারখানার পাশের ঘরেই রয়েছে। অবশ্য আমি নিচে নামি নি। অপেক্ষা করছিলুম বাবুগঞ্জ থানার লোকের।

মুখার্জি নিজেই এল মোটরসাইকেলে। কিন্তু সে ইনটেলিজেন্সের লোক বলে সবসময় সাদা পোষাকেই থাকে। তাকে বাইরে চেনে খুব কম লোক। এখানে তো চেনেই না। অথচ প্রায়ই তাকে এখানে আসতে হয় নানা কাজে।

রবীন অবশ্য চেনে। আমাকে খবর পাঠিয়েছিল। পাশের

অঞ্চল-অফিসে তাকে বসিয়ে রেখেছিল সে। আমি নেমে যাচ্ছি, দেখি রবীন ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ভেতরদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। আমার হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল—'টিকটিকি মুখুজ্যে তোকে ডাকছে কেন? কী ব্যাপার? পাকিস্তানী নাগরিক নোস তো? আমি তাহলে গেছি!'

একটু হেসে বললুম—'আরে না না। সে অন্য ব্যাপার—তোকে বলবখন।'

রবীন প্রচণ্ড উদ্বেগে বলল—'দেখিস ভাই, ডোবাসনে। তোর সঙ্গে বিশ বছরের ছাড়াছাড়ি। এর মধ্যে পাকিস্তানটান হয়েছে। তোদের অনেক তো সেখানে গেছে-টেছে!'

ওকে আশ্বস্ত করে অঞ্চল অফিসে ঢুকলুম। মুখার্জি ঝানু অফিসার। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনার নাম আনোয়ারুল চৌধুরী।

'হ্যাঁ স্যার।'

'বসুন।'

বসলুম। রবীন ভীতমুখে দাঁড়িয়েছিল এসে। মুখার্জি একটু হেসে তাকে বল—'জাস্ট এ রুটিন জব, ডাক্তারবাবু। এঁর সঙ্গে একটু দরকার আছে—কনফিডেনশিয়াল।'

'অলরাইট, অলরাইট' বলে রবীন চলে গেল। বেচারা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

দশটায় এ অফিস খোলে। তাই ঘরে এখন কেউ নেই। আমি বসার পর মুখার্জি উঠে গিয়ে দুদিকের দরজা বন্ধ করল। তারপর পাশের চেয়ারে বসে বলল—'কোন অসুবিধে হয়নি তো স্যার?

'না না। ওকে। আপনাদের খবর বলুন।'

'বীরুবাবুকে আমরা ট্রেস করেছিলুম রাত সাড়ে তিনটেয়। নিজের বাড়ি ঢোকেনি। দুলেপাড়ায় একজনের বাড়ি ছিল। ট্রেস করেছিল চৌকিদার। তখন সে সেজেগুজে বেরিয়েছে। পুকুর পাড়ে জঙ্গলে ঢুকতে দেখার পর চৌকিদার এসে খবর দিল।

আমরা তক্ষুনি দৌড়ে গেলুম। ঘিরে ফেললুম পুকুরটা। কিন্তু ওর কাছে যে ষ্টেনগান আছে, অনুমান করতে পারিনি। টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল। লাকিলি আমি বেঁচে গেলুম। একটু উঁচু আলের আড়ালে শুয়ে পড়েছিলুম। তিনজন কনস্টেবল একেবারে শটডেড। দুজন সিরিয়াসলি জখম। ওসি দত্ত সায়েবের একটা আঙুল গেছে। মিনিট দশেক লড়াই করার পর আমরা এগোতে পারলুম। কিন্তু লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।'

একটু চুপ করে থেকে বললুম—'তারপর?'

'তারপর আর কী!' মুখার্জি ম্লান হাসল।—'এখন সি. আর. পি. এসে গেছে। গ্রামে তল্লাসী হচ্ছে। বাট আই থিংক্ অল ইন ভেন। মিছেমিছি গরীব লোকগুলোকে অত্যাচার করে লাভ কী? ইভন, ডি এস পি সায়েবের সামনে আমি প্রটেস্ট করেছিলুম স্যার—আমাদের এখন চুপ করে গেলেই ভাল হত। এখন পলিটিক্স এসে জুটবে। এ্যাসেমব্লিতে উঠবে। আপনি তো রঞ্জন মৈত্রকে জানেন স্যার! ওঁকে বোঝাতে পারে এমন কেউ নেই। ডি. এম. এসে যাচ্ছেন। বেশ বাড়াবাড়ি করা হয়েছে আমার মতে!'

ওকে সায় দিয়ে বললুম—'ঠিকই। কিন্তু বীরেশ্বরের তাহলে ষ্টেনগান আছে এবং এখন সে মরীয়া—এটা বোঝা গেল।'

'ষ্টেনগান কী বলছেন? লাইট মেসিনগানও আছে—এ আমার নির্ভুল খবর। রঞ্জন মৈত্রের ইচ্ছা, ডি. এমের কাছে অর্ডার নিয়ে নদীর ধারে ওই জঙ্গল আর সবগুলো গ্রাম চষে ফেলবেন। এতে কী ফল হবে জানিনে—পুরো দলটা মাঝখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, এতে কোন ভুল নেই। তখন আর টিকিও দেখতে পাবেনা কারো। আলাদা-আলাদা হয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাবে। তাই মনে হয় না স্যার?'

'ঠিক। আচ্ছা মিঃ মুখার্জি, আপনি মৈত্রসায়েবকে আমার খবর কিছু বলেছেন?'

মুখার্জি মাথা নাড়ল।... 'মোটেও না। আপনার ইন্সট্রাকশান যা ছিল, তাই বলেছি।'

'আমি বকখালি এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, একথা শুনে মৈত্র কোন ইণ্টারেস্ট দেখালেন না?'

'নাঃ। বললেন—হি ইজ এ রোমাণ্টিক টাইপ!' মুখার্জি হেসে উঠল।

'দেখবেন, বকখালিতে আবার সি আর পি নিয়ে হামলা চালাতে না আসেন মৈত্র!'

'না স্যার। এস পি সায়েব ছুটি কাটিয়ে আজই জয়েন করার কথা। আমি গিয়ে ম্যানেজ করে ফেলব।'

'কাল রাণীহাট বাস স্টপে আপনাকে নামিয়ে দেওয়ার পর ভীষণ ভেবেছিলুম—নিরাপদে পৌছিলেন কিনা!'

মুখার্জি গুম হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, 'বলা হয়নি, আমি জোর বেঁচে গেছি স্যার! এগিয়ে পিছন ফিরে আপনার জিপটা কদ্দুর গেল দেখছি, আচমকা গুলির শব্দ। কান ঘেঁষে যাওয়া বলতে পারেন। রাস্তার নিচেই একটা গর্ত ছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। তারপর আর কোন পাত্তা নেই। আধঘণ্টা পরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পিছনের বাগানে উঠলুম। প্রায় বুকে হেঁটে যেতে হল। আমার ধারণা, রাইফেলের গুলি। সম্ভবত রাস্তার ওপাশে অর্জুন গাছের আড়াল থেকে কেউ আন্দাজে গুলি ছুড়েছিল। অন্ধকারও ছিল প্রচণ্ড। তা নাহলে নির্ঘাৎ একটা এ্যাকসিডেণ্ট ঘটত।'

'পরে ওদিকটা দেখা হয়নি?'

'না। মৈত্রসায়েব উড়িয়ে দিলেন—বললেন, ইনটেলিজেন্সের লোকগুলো সবসময় হ্যালুসিনেসনে ভোগে।'

'ছাটস ভেরি ব্যাড। সময় বা সুযোগ এলে আমি বলব এস পিকে।'

'এবার আপনার খবর বলুন স্যার।'

'এখনও কোন খবর নেই। আপনি বরং এখান থেকে যান মুখার্জি। গাড়িটা কেউ নিতে আসবে তো?'

'হ্যাঁ। পুলিন ড্রাইভার অলরেডি এসে গেছে। ওখানে চায়ের দোকানে আছে। গিয়ে খবর দিচ্ছি।'

'পুলিনকে এখানে কেউ চেনে না তো?'

'না।'

'ঠিক আছে। আমি রবীনবাবুকে বলেছি, বাবুগঞ্জের এক চেনাজানা ব্যবসায়ীর জিপ। লোক এসে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে আমি স্যার থেকে যাচ্ছি। ওখানে তেমাথা রাস্তার কাছে একটা হোটেল আছে দেখবেন—ট্রাকড্রাইভারদের আড্ডা। সরযূ হোটেল। ওখানে থাকছি আমি। সরযূবালা হোটেলওয়ালি আমাদের লোক। অসুবিধে হবে না।'

'এখানে ফাঁড়িতে যোগাযোগ করা হয়েছে?'

'সব ঠিক আছে, স্যার। দরকার হলে সব হেল্প পাবেন। আর আমি তো থাকলুমই।'

'ওকে মুখার্জি। উইশ ইউ গুড লাক।'

মুখার্জি উঠে সেলাম দিল। তারপর বেরিয়ে গেল। আমি বেরিয়ে ভেতরের বারান্দায় গেছি, অমনি রবীন বলের মতো তার চেম্বার থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়ল। চাপা ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল—'কী, কী? ব্যাপারটা কী?'

'বলব। তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। তুমি কখন ওপরে আসছ?'

রবীন ঘড়ি দেখে বলল—'সাড়ে বারোটার আগে নয়। কিন্তু ততক্ষণ আমি নিজেই মরব, নয় তো রুগী মেরে ফেলব। তোর দিব্যি আন্নু, আর অন্ধকারে রাখিস নে।'

'এক কথায় সব বলার নয়। এবং তোর পক্ষে একচুল ক্ষতিকর কোন ব্যাপারও নয়। নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ কর। খাওয়ার পর সব জানতে পারবি।' বলে ওকে কথা বলার ফুরসৎ না দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকলুম।

বাঁকে ঘুরে দেখি, রবীন তখনও নিষ্পলক চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সেই ভ্যাবলা রবীন একটুও বদলায় নি। অথচ এত বড় ডাক্তার হয়েছে—অঞ্চল প্রধান হয়েছে এবং এলাকার নিরীহধরনের রাজনীতির পাণ্ডা! ভাবা যায় না!

খুব বিশ্বাসী ও পুরনো ইনফরমার ছাড়া বাইরের কোন লোককেই আমার পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রবীনকে তাই কী ভাবে ম্যানেজ করব ভাবছিলুম। এক শর্তে ওকে পরিচয় অবশ্য দেওয়া যায়—যদি সে আমাকে লাইলিকে ধরতে সাহায্য করে। চাইলে সাহায্য সে করবে, তা টের পেয়েছি। কিন্তু যে রকম পেট আলগা ঢিলে লোক, ওকে বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ ওর সাহায্য পেলে কাজটা সহজ হত.।

শেষে ঠিক করলুম, ওকে কনফিডেন্সে নেব না।

তাই খাওয়ার পর যখন সে উদ্‌গ্রীব হয়ে মুখের দিকে তাকাল, তখন পুরো বানানো একটা ব্যাপার শোনালুম। আমি একটা চাকরির দরখাস্ত করেছি, তার একটা লোকাল এনকোয়ারি হচ্ছে। এবং লোকাল এনকোয়ারি হবে জেনেই কলকাতা থেকে এখানে চলে আসতে হয়েছে আমাকে। আর অঞ্চলপ্রধান রবীনের কাছে আসারও কারণ তাই।

রবীন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল—'কী কাণ্ড! বিশবছর আগের হদিষ আজকাল খোঁজা হয়। হ্যাঁ—আজকাল এরকম দেখছি রে। আমার কাছে প্রায়ই এসে এনকোয়ারি করে যায়

আইবিরা। আসলে বেকার বেশি, চাকরি কম—তাই এসব কড়াকড়ির কায়দা। পুরো জীবনী নখদর্পণে থাকা চায় সরকারের। অমুক সাল থেকে অমুক সাল কোথায় কে ছিল, কী করছিল—বাপ্স্! তা হ্যাঁ রে আন্নু, আমাকে তো কিছু জিগ্যেস করল না? জিগ্যেস তো আমাকেই ওরা করে। করা উচিত তাই।'

হেসে বললুম—'সে কি আমার সামনে করবে তোকে? পরে নিশ্চয় করবে। আমি বাবুগঞ্জের সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে দিয়ে আই বি ঘুঘু ম্যানেজ করলুম, বুঝতে পারছিস না?'

রবীন মাথা দোলাল। খুব বুঝেছে।

'ও যে সকালে এসে পড়বে, তা ভাবিই নি। নয়তো রাতে বা আজ সকালে তোকে বলে রাখতুম!'

'বলা উচিত ছিল। তবে ছাখ, কী মাল ওরা! ঠিক টের পেয়ে গেছে যে তুই আমার বাড়ি এসেছিস! আমার ধারণা, তোর গতিবিধির ওপর নজর রাখা হয়েছে। বি ভেরি কেয়ারফুল আন্নু। আজকাল চাকরি পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

এসব নিয়ে রবীন ঘণ্টাখানেক বকবক করার পর শুতে গেল। আমারও ঘুম পাচ্ছিল। রাতের ঘুম পোষায় নি। তাই ঘুমিয়ে পড়লুম। সে ঘুম ভাঙল একেবারে পাঁচটা নাগাদ। রবীনের বউ এসে বলল—'ঘুমোচ্ছিলেন দেখে চা খেতে ডাকিনি।'

তার হাতে চায়ের কাপ। চা রেখে সে চলে গেল। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলুম একটা রাত একটা দিন বসে থেকে কেটে গেল! এর মধ্যে লাইলিকে খুঁজে বের করার কথা ভুলেই বসে রইলুম কেন? নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলুম। ওদিকে রঞ্জন মৈত্র যা ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু করেছেন, লাইলি নিশ্চয় এতক্ষণ কেটে পড়েছে দূরে কোথাও। সর্বনাশ, আমি এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লুম কেন?

রবীনের সাড়া নেই। দ্রুত তৈরি হয়ে বেরোচ্ছি, রবীনের বউ এল।—'রাতে ভাত খান, না ময়দা?'

'আপনারা যা খান, তাই হবে। ভাববেন না।'

'আমরা ময়দা খাই।'

'বেশ তো তাই। ইয়ে—রবীন কোথায়?'

'উনি তো গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। রাণীহাট না বাবুগঞ্জ কোথায় যাবেন বললেন। কী সব হাঙ্গামা হয়েছে নাকি। ডি এম এসে খবর পাঠিয়েছেন। উনি তো আবার অঞ্চলপ্রধান—যেতেই হবে।'

এমন কেজো মহিলা আমি দেখিনি। একটাও বাজে কথা খরচ করতে চান না। রবীনের উন্নতির মূলে কী আছে, জানতে পেরেছি।

বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় মুখার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে সামনের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছিল আমার অপেক্ষায়।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলুম। মুখার্জি বলল—'লোকাল ইনফরমার ঘোরাঘুরি করছে, এখনও ট্রেস করতে পারেনি। তবে লাইলি এখনো এখানেই আছে, তার খবর ও জানে।'

'কী ভাবে জানল?'

'গতকাল বিকেলে ওর বৌ একটি ভদ্রমহিলা আর তিনজন লোককে বিলের মাঠ হয়ে গাঁয়ে ঢুকতে দেখেছিল—তাদের মধ্যে একজন লোক মনে হল বীরেশ্বর। বেশ লম্বা চওড়া সে।'

'তাহলে বীরেশ্বর তাকে রেখে আবার ফিরে যায়।'

'হ্যাঁ। বকখালি গ্রামটা অদ্ভুত। এদিকটা শহরের মতো—ওদিকে কিন্তু পুরো অজ পাড়াগাঁ। যত জঙ্গল, যত শ্রীহীন। ওদিকে যাবেন নাকি?'

'সন্ধ্যার পর যাব।'

'সেই ভাল।'

'কিন্তু এখানে বীরেশ্বরের চেলা কারা জানা নেই আপনাদের?'

'একজন ছিল—অরুণ নামে এক ছোকরা। সে কমাস আগে মারা পড়েছে সি আর পির হাতে।'

'তার ফ্যামিলি তো আছে?'

'নাঃ। তেমন কেউ নেই। ছোকরা আগে ছিল মোটর মেকানিস্ট। পরে প্রাইমারি স্কুলটিচার হয়। বাবা মা বেঁচে ছিল না, জ্যাঠার কাছে মানুষ। জ্যাঠা তো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। পুজোরি বামুন ভদ্রলোক। গুণ্ডা ভাইপোর চালচলন সইতে পারতেন না। তবে রবীনবাবুকে ধরে একটা মাস্টারি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তো...'

হঠাৎ থেমে গেল মুখার্জি। ভুরু কুঁচকে বাঁদিকে কী দেখতে থাকল। এখানে বাজার এলাকা শেষ। একটা মোটর গ্যারেজ রয়েছে। অনেক গাড়ি দাঁড় করানো আছে। কালিঝুলিমাখা মিস্ত্রিরা কাজ করছে। গাড়ির তলায় কেউ শুয়ে পড়েছে। পাশে পেট্রোলপাম্প।

মুখার্জি বলল—'পেট্রোলপাম্পের কাছে ওই ছোকরাটা দেখছেন—ওই যে রোগা মতো—'

'হ্যাঁ।'

'এতো অবাক কাণ্ড! ও এখানে এসে জুটল কখন? আর গাড়িটাই বা কার? তেল নিচ্ছে গাড়িতে। স্ট্রেঞ্জ!'

'কী ব্যাপার?'

'ওর নাম জলিল। বাবুগঞ্জের এক ভদ্রলোকের এক সময় ড্রাইভার ছিল। কিন্তু...এক মিনিট।' বলে গাড়ির নম্বরটা বিড়বিড় করে মুখস্থ করে নিল মুখার্জি। তারপর বলল—'নম্বরটা মনে রাখুন, স্যার। জলিল রিসেণ্টলি বীরুবাবুর সঙ্গে মাখামাখি করত। কিন্তু গাড়িটা কার?'

রাস্তায় প্রচুর লোক চলাফেরা করছে এখন। বুঝতে পারছিলুম, বিকেলের দিকে আশেপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য লোক কাজে অকাজে এই বাজারে এসে আড্ডা দেয়। আমরা এক বিশাল বটগাছের তলায় বাঁধানো গোল চত্বরে গিয়ে বসে পড়লুম। গাছটার

গোড়ায় কয়েকটা সিঁদুর মাখানো নুড়ি রয়েছে। একজন সাধুসন্ত মানুষ ধ্যানস্থ হয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমরা সেই জলিলকে আর গাড়িটা লক্ষ্য করছিলুম। তেল নেওয়ার পরও গাড়িটা অনেকক্ষণ সেখানে রইল। জলিল গেল ওদিকে একটা চায়ের দোকানে। তখন মুখার্জি বলল—'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না স্যার। আমি গাড়িটার হদিষ করছি। আপনি বরং ঘোরাঘুরি করুন ইচ্ছেমতো। দরকার হলে খুঁজে নেব আপনাকে।'

আমি সায় দিলে সে উঠে গেল। একা বসে রইলুম। বেলা পড়ে এসেছে ততক্ষণে। রোদের রঙ ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে এত নিষ্ক্রিয় আর ক্লান্ত মনে হচ্ছিল আমার! সব উদ্যম যেন ফুরিয়ে গেছে। লাইলি এখন আমার কাছে কবেকার ভাল-মন্দ স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে দেখা একটি চেহারা শুধু। কেন এমন হচ্ছে, বুঝতে পারলুম না।

মুখার্জি পেট্রোলপাম্পে গিয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছে দেখতে পাচ্ছিলুম। তারপর সে চলে গেল সেখান থেকে। কিছুটা দূরে ওর সেই সরযূ হোটেলের সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছিল—সদ্য আলো জ্বলে উঠেছে তাই। সে সেদিকেই যাচ্ছে। মোটর সাইকেলটা আনতে যাচ্ছে সম্ভবত। তেলটেল নেবে।

একটু পরেই মুখার্জি দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। চায়ের দোকানে সেই জলিল ছোকরাটার দিকে লক্ষ্য রাখতে অবশ্য ভুলিনি। দেখলুম, সে দোকানের বাইরে খোলামেলায় দাঁড়িয়ে গেলাসে চা খাচ্ছে। রাস্তার ওপারে আমার এখান থেকে আন্দাজ তিরিশ গজ দূরে সে আছে। মুখের একটা পাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চা খেতে সে অনেকটা সময় নিচ্ছে। তার দৃষ্টি মনে হল রাস্তাটা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকেই অর্থাৎ পূর্বে, এবং আমি আছি তার পশ্চিম উত্তর কোণে। নিশ্চয় সে কারো প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু মুখার্জি গেল তো গেলই, আর তার পাত্তা নেই। ততক্ষণে

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল। ঘড়ি দেখলুম, একঘণ্টা আমি বসে আছি। জলিল চা খেয়ে ইতিমধ্যে রাস্তায় পায়চারি করছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড় এবং সাইকেল, সাইকেল রিকশো, বাস, লরি, টেম্পোর আনাগোনা চলেছে সারাক্ষণ। জলিল মাঝে মাঝে তার আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। আর বসে থাকা ভাল দেখায় না। অনেকের কৌতূহল জাগতে পারে। অবশ্য ধ্যানস্থ সাধুটির দিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত আছি। সে গাছের গুঁড়ির দিকে ঘুরে চোখ বুজে বসে রয়েছে। আরও আধঘণ্টা কেটে যাবার পর উঠে দাঁড়ালুম। রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলুম। এই সময় তিনটে লরি এসে পড়ল। জোরে হর্ন দিতে দিতে এবং ধুলোর ঝড় তুলে চলে গেল লরিগুলো। পায়ে হাঁটা লোকেরা দুধারে সরে গেল। তারপর চোখ মুছে দেখি, জলিল নেই। প্রথমে পাম্পটা দেখে নিলুম, কালো অ্যামবাসাডারটা যেখানকার সেখানেই রয়েছে অবশ্য। কিন্তু জলিল গেল কোথায়? খুব ব্যস্ত হয়ে তাকে খুঁজতে থাকলুম। রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে দুপাশের দোকানগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টে দেখা হল। কিন্তু জলিল অদৃশ্য। তখন আরও কিছুটা এগিয়ে গেলুম। ডাইনে একটা পোড়ো জমিতে রোডস বিভাগের ড্রাম জড়ো করা রয়েছে। তার পাশে সরু একফালি পায়ে চলা পথ। কোন আলো নেই ওখানে। চোখে পড়ল, জলিল হনহন করে এগোচ্ছে সেই পথে।

একটু ইতস্তত করে আমি সেইদিকে মোড় নিলুম। তাকে এগোবার সময় দিয়ে তারপর অনুসরণ করলুম। যতটুকু পথ আবছাভাবে রাস্তার আলো গিয়ে পড়েছিল, ততটুকু পেরোতে আমার প্রচণ্ড ঘাম হল। অভ্যাসমতো বগলের ফাঁকে রিভলবারটা জামার ভেতরে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। অন্ধকার জায়গায় পৌঁছেই সেটা দড়ির ফাঁস খুলে বের করে প্যাণ্টের পকেটে রাখলুম। '৩৮ ক্যালিবার রিভলবার, তাই বেরিয়ে রইল বাঁটের দিকটা। তখন প্যাণ্টের ডানপকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখলুম।

দেখি একটা বাগানে গিয়ে ঢুকছে রাস্তাটা। জলিলকে আবছা দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ। এবার বাগানের তলায় ঘন অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল।

সমস্যায় পড়া গেল নিশ্চয়। পায়ের নিচের সরু রাস্তাটা অনুমান করতে ভুল হচ্ছেনা—কারণ পায়ের ঘষা লেগে সেখানে নগ্ন মাটি বেরিয়ে পড়েছে এবং দুধারে শুকনো ঘাস রয়েছে। খুব সাবধানে এগিয়ে চললুম। আমার জুতোয় রবারের সোল থাকায় নিঃশব্দে এগোনো যাচ্ছিল।

বাগানটা দেখলুম ছোট। পার হতেই একটা ফাঁকা মাঠে পড়া গেল। মাঠে আবার জলিলকে আবিষ্কার করলুম। প্রচণ্ড অন্ধকারে এতক্ষণ চলার পর দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এসেছিল।

আমাকে আশ্বস্ত করে জলিল এতক্ষণে গান গেয়ে উঠল। ওর গানটা একটু অদ্ভূত মনে হল। হিন্দি ফিলমের গান। হুহু করে বাতাস বইছিল বলে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। শুধু মনে হল, গানটা যেন সে সংকেতবাক্যের মতো ব্যবহার করছে।

সামনে গাছপালার মস্তো উঁচু কালো পাঁচিল। এবার তাকে নির্ঘাৎ হারিয়ে ফেলব বলে আরও কয়েকপা জোরে এগিয়ে গেলুম—আর এতক্ষণে জলিল দেখলুম সামনে মাটির ওপর টর্চের আলো ফেলল।

বুঝলুম, কত সাবধানী ছোকরা। আর অসুবিধে হল না অনুসরণ করতে। তার আলোর সাহায্যে বোঝা গেল পায়েচলা রাস্তাটা সম্ভবত একটা দীঘি বা পুকুরের পাড়ে উঠেছে। বড়বড় তালগাছও রয়েছে পাড়ে। সে উঁচুতে ওঠার পর একটু ইতস্তত করে পা বাড়াচ্ছি, হঠাৎ শুনলুম কে ওপরের দিকে চাপা গলায় কথা বলে উঠল।

আর এগোলুম না। রাস্তা থেকে সরে চষা জমির ওপর একটু এগিয়ে বসে পড়লুম একটা আলের আড়ালে।

উঁচু জায়গায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জলিল কারো সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু বাতাস আর তালপাতার খড়খড় শব্দে কিছু শোনা যাচ্ছে না।

দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট গেল। তারপর দেখি জলিলের টর্চের আলো পড়ছে। সে ফিরে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম আলের নিচে। কিন্তু মাথাটা উঁচু করে রাখলুম।

চারজন লোক নেমে এল উঁচু জায়গাটা থেকে। আর কোন কথা বলছিল না ওরা। আলো এমনভাবে পড়ছে সামনের মাটিতে, পিছনের লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছেনা। তারা আমার বিশগজ তফাত দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে আমি উঠে দাঁড়ালুম। ফের সেই বাগানে না ঢোকা অব্দি আমাকে অপেক্ষা করতে হল।

বেশ কিছু সময় দিয়ে তখন আলপথে উঠলুম। নিঃশব্দে বাগানে ঢুকলুম। পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলুম। আর ওরা আলো জ্বালছে না। না জ্বাললেও ক্ষতি নেই। বড় রাস্তার বাজারে পৌঁছলে ওদের দেখতে পাব।

বাগান পেরিয়ে যাবার সময় ভাবছিলুম, জলিলকে অনুসরণ না করলেও হত। পাম্পের কাছে থাকলেও চলত। কিন্তু রিস্ক নিতে চাইনি। কিংবা ভেবেছিলুম…

হঠাৎ আমার পিছন থেকে কে টর্চ জ্বালল। তারপরই যা ঘটল, তা সাংঘাতিক এবং নেহাৎ ভাগ্যের জোরে বেচে গেলুম, বলা যায়।

টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠলুম, এটাই আমাকে বাঁচাল। হয়তো সেই ইনটুইশানের কীর্তি।

আমি লাফ দিয়েই একটা গাছের আড়ালে পৌঁছবার আগেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনলুম। শব্দটা রিভলবারের বলে মনে হল। আরেকবার গুলি ছুড়তেই এক লাফে গড়িয়ে আরও মোটা একটা গাছের আড়ালে চলে গেলুম। টর্চটা নিভেই আবার জ্বলে উঠল। এদিকওদিক ঘুরে লোকটা আমাকে খুঁজছিল। আমার ৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার কখনও আমাকে নিরাশ করে না। টর্চের আলোটা গুঁড়িয়ে দিল প্রথম আঘাতেই। তারপর 'বাপরে'

বলে কে চেঁচিয়ে উঠল। মনেহল, দ্বিতীয় বার কথা বলার ক্ষমতা ওর আর না আসতেও পারে।

আন্দাজে কদাচ গুলি ছুড়ি না। তাই অপেক্ষা করছিলুম। কিন্তু আর কোন শব্দ নেই। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর উঠে দাঁড়ালুম। এবং সাবধানে বাজারের দিকে এগোলুম। জলিলরা গুলির শব্দ শুনেছে কিনা কে জানে। মরীয়া হয়ে বাগানটা পেরোলুম। কিন্তু ওদের কোন পাত্তা নেই। সম্ভবত গুলির শব্দে কিছু অনুমান করেই খুব ঝটপট হেঁটে গেছে।

রোডসের ড্রামগুলোর কাছে পৌঁছে ওদের আর দেখতে পেলুম না। মনে হল রাস্তা থেকে কেউ গুলির শব্দ শোনেনি। সতর্ক চোখে চারদিকে লক্ষ্য রেখে পেট্রোলপাম্পের দিকে চললুম।

গিয়ে দেখি রাস্তায় মুখার্জি মোটর সাইকেলে চেপে বসে রয়েছে; ষ্টার্ট দেওয়ায় রয়েছে, তার ছুচোখে ব্যস্ততা। আমাকে দেখেই বলল —'কুইক স্যার। ওরা বেরিয়ে গেল এইমাত্র। আর একমিনিট দেখে আমি একা ফলো করতুম!'

লাফিয়ে পিছনে উঠে বসতেই মোটরসাইকেল উড়ে চলল প্রায়। মুখার্জি একবার বলল—'ফাঁড়িতে খবর পাঠিয়েছি। জিপ নিয়ে আমাদের লোকজন এসে যাবে।'

বকখালি বেশ উঁচু জায়গায়—কারণ এর পর আমরা ঢালু উৎরায়ের রাস্তায় পড়লুম। দুধারে ফাঁকা মাঠ। রাস্তার দুপাশেই উঁচু গাছের সার। দূরে ও কাছে কিছু গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছিল। গাড়িগুলো ওদিকেই যাচ্ছে। কোনটা সেই কালো অ্যামবাসাডার বোঝা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে সামনে থেকে লরি বা বাস এসে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। মুখার্জি বিকৃতমুখে গাল দিয়ে উঠছিল।

এই রাস্তাটা মোহনপুর ষ্টেশনে শেষ হয়েছে। তাহলে ওরা ট্রেন ধরবে নিশ্চয়। খুব আশা জাগল। একসময় আমি জিগ্যেস করলুম—'লাইলিকে চিনতে পেরেছিলেন তো?'

মুখার্জি জবাব দিল—'আমি কিন্তু কাছাকাছি দেখি নি। পাম্পে গাড়িটা এনে তেল ভরলুম। তারপর আপনার খোঁজে রাস্তা চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। বারকতক চক্কর দেবার পর এসে দেখি অ্যামবাসাডারটা নেই। জিগ্যেস করলুম। একজন বলল—ওই তো চলে যাচ্ছে। তখন আমার অবস্থা বুঝুন। একবার ভাবলুম, একা ফলো করি—আবার ভাবলুম, আপনাকে ছাড়া এগোব না, ততক্ষণে ফাঁড়ির লোকেরাও এসে পড়বে। যাই হোক, অসহায় চোখে অ্যামব্যাসাডার চলে যাওয়া দেখলুম। আসলে স্যার, নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম যেন।'

'লাইলিকে তাহলে…'

বাধা দিয়ে মুখার্জি বলল—'মোটকথা গাড়িতে একজন স্ত্রীলোক আছে। পাম্পের লোকে বলল। আমিও খানিকটা দেখতে পেয়েছিলুম রাস্তার আলোয়।'

'বীরেশ্বর নিশ্চয় সঙ্গে আছে!'

'বুঝতে পারছিনে। খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে পারিনি পাম্পের লোকটাকে। তবে সে কি না থাকবে?'

'তাহলে তো লড়াই না দিয়ে ও ছাড়বে না।'

'সে আর বলতে? দেখা যাক্।'

আমরা আর কোন কথা বললুম না। উত্তেজনায় দুজনেরই দম বন্ধ হয়ে আসা স্বাভাবিক। সামনে একটা ছোট্ট বাজার এসে গেল। বাজারটা পেরিয়ে আবার ফাঁকা মাঠ। এসময় রিভলবারের খরচ করা গুলিটার কথা মনে পড়ল। তখন পা ছড়িয়ে প্যান্টের বাঁপকেট থেকে একটা কার্তুজ বের করে রিভলবারটা তৈরী রাখলুম।

কিন্তু ক্রমশ আবার সেই নিস্তেজ ভাবটা ফিরে আসছিল। তাই মনে মনে ভাবলুম, তাহলে কি এবার লাইলিকে মৃত অবস্থায় গ্রেফতার করা ছাড়া কোন উপায়ই নেই?

আট

অনেকবার এমন করে রাতের অন্ধকারে হানা দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কম নয়। এখনও গা শিউরে ওঠে সে সব কথা ভাবলে। জীবনে আর যেন অমন রাত না আসে বলে কামনা জানাই।

অথচ ঠিকই এসে পড়ে তেমনি আরেক রোমাঞ্চকর রাত। আর সঙ্গে সঙ্গে কী নেশা এসে পাগল করে দেয়। উত্তেজনায় শিরা ফুলে ওঠে। একটা প্রচণ্ড নৈতিক সাহস এসে ভর করে বুকে। মনে হয়, এ অভিযান পাপের বিরুদ্ধে, অন্যায় ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে। নিজেকে ভেবে নিই মানবতার প্রহরী। যে অসামাজিক মানুষটি অসংখ্য লোকের চোখের ঘুম কেড়েছে, কিংবা যার অস্তিত্ব দেশের পক্ষে বিপজ্জনক—তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যক্তিগত ভাবেও একটা আশ্চর্য জোর পাই।

অথচ মোহনপুরের পথে এই নৈশ অভিযানে শুধু বারবার একটা চাপা ক্লান্তি আমাকে টেনে ধরছিল। সেই ক্লান্তি এক নিষ্পাপ শিশুর মতো পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলছিল—কেন, কেন, কেন?

আর, মুখার্জি যখন বলল, 'মনে হচ্ছে সামনের ওই গাড়িটা—' অমনি কাল দুপুরে নদীর ধারে লাইলির কথাটা মনে পড়ে গেল।

লাইলি আমাকে কুকুর বলেছিল।

আমি রাষ্ট্রের মালিকদের এক দাসানুদাস কুকুর।

বীরেশ্বর বলেছিল, রাষ্ট্র আসলে মানুষকে বা ব্যক্তিকে আটকে রাখার খাঁচাকল। তারা নাকি দুনিয়াটা বদলাতে চায়। তাই রাষ্ট্র তাদের চোখে দুষমন। আগে রাষ্ট্রকে আঘাত হানতে চায় তারা। রাষ্ট্রের কাঠামো যা কিছু—সরকার, পুলিশ, আমলা, বিত্তবানশ্রেণী, এবং সেনাবাহিনী—প্রত্যেকটা যন্ত্রাংশের ওপর তাদের ক্রোধ, এবং সেগুলোই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য।

এবং লাইলি তাদের এক আঞ্চলিক নেত্রী।

লক্ষ্য যদি হয় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা, তাহলে রাষ্ট্রের যা কিছু আইন বা বিধান, সবই তাদের চোখে অসঙ্গত। রাষ্ট্র যখন অন্যায়, তখন তার সব নির্দেশ ও নিয়মকানুনই অন্যায়।

আমার মাথা গুলিয়ে যেতে থাকল ক্রমশ। সত্যি কি আমার চোখে এই দেশ সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্র এবং দুনিয়া বাঞ্ছিত সুন্দর? আমি কি এর মধ্যে তৃপ্তি অনুভব করি? মোটকথা, আমি কি এই সমাজে সুখী?

সুখদুঃখ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাপার, খুবই জটিল। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবে যে আমরা আজকাল সমাজকে মোটেও আর সুখের আধার ভাবি না? এবং ভাবিনা বলেই তো যে-কোনভাবে বেঁচেও সুখী হতে চেয়ে চুরি ডাকাতি করি, ভেজাল দিই, জুয়া খেলি —সবরকমের অন্যায়কে গোপন থাবায় আঁকড়ে ধরি। দিনে দিনে আমাদের সমাজ-বিদ্রোহের ভাব বাড়তে বাড়তে আজ কি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় নি?

গাড়িটা এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম—কালো এ্যামবাসাডার —পিছনে নাম্বারটা লাল আলোর তলায় উজ্জ্বল। সেই নম্বর!

প্রচণ্ড জোরে সে চলেছে। তার গতি বিস্ময়কর। আমার মন থেকে কে চেঁচিয়ে বলে উঠল—সাবাস বীরেশ্বর! সাবাস লাইলি খাতুন! তোমাদের গতির দোলায় জগু্ধরা পুরনো লঝ্‌ঝড় পৃথিবীটা তার রাষ্ট্র সমাজ পরিবার নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাক্। তা না হলে নতুন পৃথিবী গড়ে ওঠার জায়গা পাবেনা।

নিজের রিভলবারটা এত উদ্ভট আর হাস্যকর লাগল, এত তুচ্ছ মনে হল ওই গতির বিশালতা ও শক্তির তুলনায়, পকেটে ঠেসে দিলুম। প্রভুভক্ত কুকুরের একটা ছোট্ট দাঁত ঠিক জায়গায় বসে গেল।

আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম ক্রমশ ? কাল দুপুরে লাইলির সুন্দর শরীরটা নিয়ে যা সব করেছি, তীব্রভাবে মনে পড়ে যেতে থাকল, আর দুঃখে, নিজের প্রতি ঘৃণায়, অনুশোচনায় অস্থির হয়ে পড়লুম। লাইলি, আমার সেই ছোট্ট কচি সুন্দর বালিকা, প্রিয়তম শরীর! লাইলি মনে করিয়ে দিয়েছিল তার পায়ে কাঁটার ক্ষত চুষে দেওয়ার প্রাচীন কাহিনী। তবু আমি পিছু ফিরিনি। আমি কুকুর ছাড়া কী ? সে ঠিকই বলেছিল! নীচ কুকুরের মতো তাকে কামড়ে ধরে পৌঁছে দিতে চেয়েছি মনিবের কাছে। সেই লাইলি পৃথিবীকে বদলাতে চেয়েছে, এতে তো আমারই সুখী হবার কথা সবচেয়ে বেশি। হতে পারে তাকে নিয়ে কোন ধুরন্ধর মতলববাজ খেলা করছে, কিন্তু তার ইচ্ছেটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ কি আগের দিন নদীর ধারে জঙ্গলে পাই নি ?

লাইলি, তোমরা জয়ী হও! মনে মনে বারবার কথাটা বললুম। আর মুখার্জি পিছু ফিরে বলল—'কিছু বলছেন স্যার ?'

'মোহনপুর কতদূর ?'

'এসে যাচ্ছে। সামনের বাঁক পেরোলেই আলো দেখতে পাবেন।'

'মুখার্জি!'

'বলুন স্যার ?'

'আপনাদের কোম্পানির পাত্তা নেই যে!'

মুখার্জি পিছু ফিরে দেখে নিয়ে বলল—'ওদের আঠারোমাসে বছর। পুলিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন মজবুত থাকলে কি দেশের এমন অবস্থা হয় স্যার ? তাও তো আপনাদের কলকাতায় মোটামুটি সরকারের চোখের সামনে বলে কাজকর্ম চলছে। মফঃস্বলে—
—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যা হয়েছে, কহতব্য নয়। কানের কাছে বোমা ফাটলে বড় জোর হাই তোলে সব! তার ওপর সর্বের মধ্যে এখানে ভুত গিজগিজ করছে।'

'ট্রেন আসার পরও যদি আমাদের লোক না এসে পৌঁছায় কী করব বলুন তো ?'

'আপনিই বলুন।'

'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন, কী করতে চান ?

'বীরেশ্বরের কাছে ষ্টেনগান থাকতে পারে, স্যার।'

'তাহলে মুখার্জি, তুটো রিভলবার দিয়ে কতটা সুবিধে করা যাবে ?'

'একটুও না, স্যার।'

'তাহলে ?'

'আপনি যা বলবেন।'

'আমি যদি বলি…যদি বলি, ওরা চলে যাক, আমরা ফিরে যাই ?'

'স্যার ?' মুখার্জি গতি কমাল।

'মুখার্জি কি অবাক হলেন ?'

'খুব, স্যার! ভীষণ।'

'কেন বলুন তো ?'

'মিঃ চৌধুরী অদ্ভুতকর্মা কিংবদন্তীর মানুষ—আমাদের স্টেটের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টে শুধু নয়, সারা পুলিশ মহলে তিনি এক ম্যাজিসিয়ান বলে বিখ্যাত। তাঁকে একথা বলতে শুনলে অবাক নিশ্চয় হবো। তবে অন্য কারণে। ভাবব, নিশ্চয় কোন সাংঘাতিক প্লান তাঁর মাথায় এসেছে, অথচ আমি ধরতে পারছিনে, তাই অবাক হচ্ছি।'

'কোন প্ল্যান নেই ব্রাদার।' হাসতে হাসতে বললুম।…'সত্যি বলছি—আমি টায়ার্ড। ফেড আপ। ছেড়ে দিন।'

'স্যার কি আমাকে পরীক্ষা করছেন ?'

'না। আগে গাড়িটা দাঁড় করান। তুজনে সিগ্রেট খেয়ে নিই।'

'ওদের মিস করব স্যার! আর মাথা খুঁড়েও পাত্তা পাবেন না!

'না পেলে কী? আপনার চাকরী যাবে?'

মুখার্জি চুপ করে গেল।

'এবং আমি ব্যর্থ হলে আমারও চাকরী যাবে না মুখার্জি!'

মুখার্জি গাড়ির গতি কমিয়েছিল। এবার বলল—'মনের জোরটা চলে যাচ্ছে স্যার। আর কী বলব?'

'অবশ্য আপনি খেতাব বা পদক চাইলে, অন্যকথা।'

'আমি কিছু বলছিনা স্যার।'

'মুখার্জি, মনে হচ্ছে সামনে ব্রিজ। ওখানে দাঁড় করান।'

ব্রিজটা বেশ বড়। নিচে নদী রয়েছে। আমাদের মোটর সাইকেলটা থামল। দুজনে নেমে ব্রিজের রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালুম। সিগ্রেট বের করে ওকে দিলুম। তারপর দেশলাই জেলে প্রথমে ওরটা, পরে নিজেরটা ধরালুম। বাঁকের দিকে কালো এ্যামবাসাডার ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

'মুখার্জি?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আপনি কি ভাবছেন, আমি বীরুর ষ্টেনগানের সঙ্গে লড়া যাবেনা বলে ওদের ছেড়ে দিতে চাচ্ছি?'

'তা মোটেও ভাবিনি স্যার।'

'স্যার স্যার করবেন না প্লিজ। আমি আপনার বন্ধু হয়ে যেতে চাই।'

মুখার্জি অন্ধকারে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওই লাইলিকে আমি এক সময় কত ভালবাসতুম জানেন?'

'শুনেছি।'

'কিন্তু সেজন্যে আজ আমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছি না। আপনি আরও জানেন, ওকে মৃত অবস্থায় গ্রেফতারের ক্ষমতা আমার আছে। এমনকি ওকে খুন করার হুকুমও গোপনে আমাকে দেওয়া হয়েছে।'

'জানি।'

'কাজেই যে কোনভাবে ওকে রিভলবারের গুলিতে খতম করা আমার পক্ষে সহজও বটে, বেআইনীও নয়। তাই, বীরুর ষ্টেনগান থাকা না থাকা আমার কাছে সমান। কিন্তু মুখার্জি, কাল দুপুরে ধরে আনার সময় লাইলি আমাকে কুকুর বলেছিল! এই চরম মুহূর্তে এসে হঠাৎ আমার মন বিদ্রোহ করে বসছে। আমি কুকুর হতে চাইনে—অন্তত এই একটা সময়ে—এই একটা বার। জীবনে অন্তত এই একটি মেয়ের চোখে আর আমার কুকুর হতে ইচ্ছে করছে না মুখার্জি। ডু ইউ ফিল ইট? ডু ইউ?'

আমি ওর কাঁধ ছুয়ে ঝাঁকুনি দিলুম। মুখার্জি আস্তে বলল—'আই ফিল ইট।'

'আরও অনেক কুখ্যাত অপরাধী আমি পাব, তাদের পিছনে হানা দেব—কিন্তু কেউ মুখার্জি, কেউ অমন তীব্র ঘৃণায় বলবেনা যে আমি মনিবের কুকুর। কেউ আমাকে বলে উঠবেনা—তোমার কি কিছু মনে পড়ে না? তারা জানে—আনোয়ার চৌধুরী তার ডিউটি করছে, আর কিছু নয়। আসলে সে ভাষা লাইলি ছাড়া কারও জানা নেই।'

'আপনি এক্সাইটেড। একটু ড্রিঙ্ক করবেন?'

'আছে নাকি?'

মুখার্জি গাড়ির দিকে ঝুঁকল। তারপর একটা হুইস্কির বোতল বের করল। বলল—'এমনি খেতে হবে কিন্তু। গ্লাস নেই।'

'খুব বুদ্ধিমান মশাই আপনি!' ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মেরে বোতলটা নিলুম।

মুখার্জি বলল—'সঙ্গে সবসময় রাখি স্যার।'

'ও—নেভার স্যার! আমরা বন্ধু।'

দুজনে তিনবার করে গলায় ঢেলে যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে নিলুম। এতক্ষণ কোন গাড়ির যাতায়াত ছিল না। এবার একটা লরি বকখালির দিক থেকে এসে প্রচণ্ড জোড়ে বেরিয়ে গেল। মুখার্জি বলল—'দেখছেন কাণ্ড? আমাদের গাড়িটা এখনও এল না!'

হাসতে হাসতে বললুম—'তাহলে ইতিমধ্যে রঞ্জন মৈত্রের বাগড়া পড়ে গেছে।'

মুখার্জি লাফিয়ে উঠল :—'অসম্ভব নয় স্যার! খুবই সম্ভব। মনে হচ্ছে মৈত্র সায়েব হুকুম দিয়েছেন, বকখালির সব কোম্পানি বিলে নামুক এবং পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে রাখুক জঙ্গল এরিয়া।'

খুসি হয়ে হাসতে থাকলুম। খালি পেট এবং ক্লান্তির ফলে নেশাটা তক্ষুনি জমে এসেছিল। কিন্তু মুখার্জির কোন বৈলক্ষণ্য টের পাচ্ছিলুম না।

এবার বললুম—'ইচ্ছে করছে, লাইলিকে ট্রেনে চাপার সময় একবার হাত নেড়ে টা টা করে আসি। চলুন না ব্রাদার!'

'তাহলে নির্ঘাৎ বীরেশ্বর ষ্টেনগান চালাবে দেখবেন।'

'চালাক্ না! না হয় মরেই যাব। মরতে ভয় কিসের হে মুখার্জি? চলো, লেট আস প্রসিড!'

'স্যার, প্লীজ! একটু ভেবে নিন—কী ভাবে কী করা যাবে।'

'আমার সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়েছি ব্রাদার। নাও, স্টার্ট!'

মুখার্জি কী ভাবল কে জানে—হয়তো ভাবল, এ আমার নতুন কোন চাল—সে মোটর সাইকেলে চাপল। আমি যথারীতি পিছনে বসলুম। গাড়ি আবার চলল। বেশ জোরেই এগোল মুখার্জি।...

তবু হলফ করে বলছি সত্যিসত্যি কী করব জানতুম না। খুব মুক্ত মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। আর নেশার ঘোরে পৃথিবীজুড়ে এক নিষিদ্ধ স্বাধীনতার স্রোত বইছে দেখছিলুম। সেই স্রোতে ভেসে চলেছে লাইলি আর বীরেশ্বর—তারা দুজনেই আমার ছেলেবেলার সঙ্গী। তাই আমারও ভাসতে ইচ্ছে করছিল তাদের সঙ্গে।

কিন্তু লাইলি আমাকে কুকুর বলেছে! নিজেকে ঘৃণা করতে

বলেছে—শিখিয়েছে। এটাই আমাকে গতকাল তুপুর থেকে ক্ষ্যাপামির চরমপর্যায়ে তোলার পর এখন ক্রমশ ক্লান্ত করে ফেলেছে। আর কোন শক্তি দেখতে পাচ্ছিনা নিজের মধ্যে।

এখন লালবাজারের বড়কর্তাদের কেউ কিংবা জেলার ডি এস পি রঞ্জন মৈত্র, অথবা নেহাৎ এই আই বি সাবইন্সপেক্টর মুখার্জিও আমার পাছায় লাথি ঝেড়ে যদি এগোতে বলে, আমার ভয় হচ্ছে বদমাস নচ্ছার কুকুরটা আমার ভেতর গরগর করে উঠবে এবং দাঁত বের করে তেড়ে যাবে বীরেশ্বর লাইলির দিকে।

একটা প্রচণ্ড ধরণের প্ররোচনা ছাড়া কিছু করতে পারবনা।

দেখতে দেখতে স্টেশনের বাজারের আলো সামনে এসে গেল। অল্পস্বল্প ভিড় রয়েছে দোকানপাটে। ইলেকট্রিক আলো নেই এখানে—সব হ্যাসাগ ডেলাইট কিংবা কারবাইড বাতি জ্বলছে। ষ্টেশনটা উঁচুতে। ধাপের ওপরে গেট, নিচের মাঠে কয়েকটা গাড়ি রয়েছে। লরি, টেম্পো, প্রাইভেট কার, সাইকেল রিকশো, এমন কি ঘোড়ার গাড়িও। ট্রেনের অপেক্ষা করছে সবাই।

একপাশে ঘোড়ার গাড়িটার আড়ালে মোটর সাইকেল দাঁড় করাল মুখার্জি। তুজনে নামলুম। পরস্পরের দিকে একবার তাকালুম। তারপর মুখার্জি বলল—'এক মিনিট। আপনি এখানেই ছায়ার মধ্যে থাকুন। আমি একবার চক্কর দিয়ে আসি।'

সে চলে গেল। আমি সিগ্রেট ধরালুম। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করলুম আবার। প্রশ্ন এখন তুটো।

আমি কি লাইলিকে মৃত অবস্থায় গ্রেফতার করব ?

অথবা তাকে টা টা করব অর্থাৎ ছেড়ে দেব ?

ঠিক করলুম, মুখার্জি যা খুসি করুক, আমি ছেড়েই দেব। আমার নার্ভ আর একটুও কর্তব্যপালনে সক্ষম নয়।

এবং ফিরে গিয়েই এ চাকরিটাও ছেড়ে দেব। হঠাৎ ছাড়ার অসুবিধে হলে লম্বা ছুটি নিয়ে চলে যাব কোথাও। আমার বিশ্রাম

দরকার আপাতত, তারপর দরকার মুক্তি। স্বাধীনতা কী, দূর থেকে আমার দেখা হয়ে গেছে এবার।

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলুম। মুখার্জি ফিরে আসার আগেই ছায়া থেকে বেরোলুম। সেই সময় চোখে পড়ল, কালো এ্যামবাসাডার গাড়িটায় ষ্টার্ট দেওয়া হচ্ছে। বড় জোর পনের মিটার দূরে গাড়িটা ডাইনে বেঁকে রাস্তায় উঠল। সেই জলিল ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছিলুম। গাড়ির ভিতরে কোন লোক নেই।

ওদিকে টিকিট কাটার ঘণ্টা বেজে উঠল ষ্টেশনে। ডাউন ট্রেন আসছে মনে হল—তার মানে কলকাতা যাবে ট্রেনটা। যাত্রীদের ভিড় আছে। কারণ, কলকাতা যেতে হলে এ অঞ্চলে রাতের গাড়িই আরামদায়ক। টানা সাত আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে কেটে যায়। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি টের পাওয়া যায় না।

গেট দিয়ে ষ্টেশনে ঢুকলুম। টিকিট কেনার লাইন পড়েছে লম্বা। পাশ কাটিয়ে ষ্টেশনের সামনের চত্বরে গেলুম। তারপর প্রথমে ডাইনে, পরে বাঁদিকে তাকালুম। এলাকা থেকে ব্যাপারীরা প্রচুর পটল চালান দেয়। পটলের বস্তা ডাঁই করা রয়েছে একখানে। জায়গায়-জায়গায় আরও অজস্র মাল জড়ো করা আছে। যাত্রীরা আছে ছড়ানো ছিটানো। প্লাটফর্মের ডানদিকটা পুরো ফাঁকা, কোন শেড নেই। বাঁদিকে কিছুটা গেলে একটা বড় শেড রয়েছে। শেডের পিছনে ওয়েটিং রুম। ষ্টেশনটার এখন উন্নতি হয়েছে তাহলে। আগে ছিল একটা ছোট্ট ষ্টেশন মাত্র।

শেডের দিকে গেলুম না। ভিড় ছিল সেখানে। ডানদিকটা ফাঁকা ছিল কিছুটা। সেদিকেই চললুম। বেড়ার ধারে উঁচু গাছ রয়েছে কয়েকটা। প্লাটফর্মের মধ্যেও গোড়া বাঁধানো কৃষ্ণচূড়ার গাছ দেখলুম। ফুলে ফুলে ভরে আছে। কেরোসিন বাতি জ্বলছে লাইট পোস্টে। আলো এদিকটায় বেশ আবছা।

তারপর দেখতে পেলুম বীরেশ্বরকে। সে প্লাটফর্মের শেষপ্রান্তে বেড়ায় পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। তার পাশেই বেড়ার একটা ফ্রেম গলিয়ে লাইলির ভ্যানিটি ব্যাগটা ঝোলানো রয়েছে। বীরেশ্বর পশ্চিমদিকে মুখ ঘুরিয়ে হয়তো লাইলিকেই দেখছে।

আমার কাছ থেকে ওদের দূরত্ব বড় জোর পনের মিটার। আমি তক্ষুনি গোড়া বাঁধানো একটা পিপুল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলুম।

এখন আচমকা ওদের চোখে পড়লেই আমাকে আক্রমণ করবে, তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু আমি আক্রমণ করতে তো আসিনি! মুখার্জি এসময় এসে পড়লেই বিপদ। তাকে ঘাড় ঘুরিয়ে খুঁজলুম —দেখতে পেলুম না। মনে মনে কামনা করলুম, ট্রেন আসা পর্যন্ত সে যেন না আসে এদিকে।

ওরা একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে আমার সামনে দিয়ে দুজন লোক গেল। আমার দিকে ঘুরেও তাকাল না। বীরেশ্বর ঘুরতেই দেখলুম একজন তাকে টিকিট আর টাকাকড়ি দিল। বীরেশ্বর সেগুলো বুকপকেটে গুঁজে নিচু গলায় কী বলল। তখন লোকদুটো চলে এল। আসার সময়ও কোনদিকে তারা তাকাল না। বুঝলুম, ওরা বেশ নিশ্চিন্ত। ওরা ভাবেও নি যে কেউ ওদের গতিবিধি টের পেয়েছে।

এই সময় একদল সাঁওতাল পুরুষ ও স্ত্রীলোক বাচ্চাকাচ্চা লটবহর নিয়ে উত্তরের নির্জন অন্ধকার থেকে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল এবং আমার গাছটার উল্টোদিকে ভিড় জমাল। এতে আমার আড়ালে থাকার খুব সুবিধেই হল। তারপর এল এক সবজিব্যাপারী, ঠেলায় তার মালপত্তর নিয়ে রেলকুলিরাও এল। ফলে বেশ কিছুটা ভিড় জমে গেল। বীরেশ্বর এদিকে একবার তাকিয়েই আগের মতো ঘুরে রইল। একবার তাকে লাইলিকে

ডাকতে শুনলুম। জবাবে লাইলি কিছু বলল। কিন্তু তার কাছে সরে গেল না।

আমি ততক্ষণে প্রচণ্ড ঘামছি। প্রশ্ন—সামনে যাব, নাকি নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে আড়ালেই থেকে যাব?

সময় কেটে যাচ্ছিল। আমার বয়স বাড়ছিল সবকিছুর সঙ্গে। তখনও মুখার্জির পাত্তা নেই। কোন বিপদে পড়ল না তো? তবে এ সময় তার বিপদে পড়াটাই চাইছিলুম। সে যেন এদিকে পা বাড়াতে না পারে।

তারপর ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল—ডাউন ট্রেন ডিসট্যান্ট সিগন্যালের বাঁকের আকাশে আলো ফেলেছে। সবাই সেই আলো দেখছে। আলোটা বাঁক ছাড়াতেই দেখা গেল সামনাসামনি। আলোটা উজ্জ্বল হতে থাকল। সবকিছুর ছায়া সাঁৎ সাঁৎ করে ঘুরে যেতে লাগল। আরো কাছে এসে গেল ট্রেন। তীক্ষ্ণ হুইসলের শব্দ শোনা গেল। যারা লাইনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, পিছিয়ে গেল একটু। কিন্তু লাইলি স্থির দাঁড়িয়ে আছে কিনারায়। বীরেশ্বর একটু এগিয়ে তাকে ডাকল। লাইলি স্থির।

হঠাৎ আমার মধ্যে সেই পুরনো ইন্‌টুইশান জেগে উঠল। উজ্জ্বল আলো পড়েছিল লাইলির চোখে—শুধুমাত্র একটা চোখ দেখতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু ওই চোখে কী ছিল—কিছু একটা ছিল। আমি গাছের আড়াল থেকে একলাফে বেরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম—'না, না, না!'

ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে ইঞ্জিন বেরিয়ে গেল, কামরাগুলো পেরিয়ে যেতে থাকল ঝড়ের মতো, আর বীরেশ্বরের নাড়ি ছেঁড়া আর্তনাদ শুনতে পেলুম—'লাইলি!'

ভিড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন। একটা চিৎকার মুখে মুখে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেনের সঙ্গে উত্তর থেকে দক্ষিণের সীমান্তে—এ্যাকসিডেণ্ট! এ্যাকসিডেণ্ট!' আর, একলাফে বীরুকে আমি

ধরে ফেললুম, সে লাইনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে দুহাত নেড়ে প্রচণ্ড চেঁচাচ্ছে।

তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতেই সে পড়ে গেল। তারপর আমাকে দেখতে পেল। চোখের পলকে দেখলুম, তার হাতে একটা রিভলবার। ভয়ে চোখ বুজলুম। তারপর একটা কিছু ঘটল। গুলির শব্দ শুনলুম মাথার ওপর। ট্রেনটা তখনও থামেনি, গতি ক্রমশ কমে আসছে। চোখ খুলে দেখি, মুখার্জি বীরুকে পিছন থেকে ধরে ফেলেছে। একজন সাহসী লোক সেই সময় বীরুর রিভলবারসুদ্ধ হাতের ওপর জুতো চাপিয়ে ঠেসে ধরল। ভিড়ে ডুবে গেল দৃশ্যটা। মুখার্জির চিৎকার শুনলুম—'চৌধুরীসায়েব, চৌধুরীসায়েব! এখানে আসুন!'

আমি অবশ্য লাইলিকে খুঁজছিলুম। তাকে কি তাহলে অবশেষে মৃত অবস্থায় গ্রেফতার করতে হচ্ছে? কিন্তু চারপাশে যেসব মুখ দেখছি, তা জীবিতের। কোথায় গেল সেই মুখ? ট্রেনটা শিরা টানটান করে দাঁড়াল। কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ করে চাকাগুলো থামল। ভিড়ে ঢুকে চাকার তলায় শুধু ঘন ভয়ঙ্কর এক অন্ধকারই দেখলুম। মানুষেরা সেখানে ঝুঁকে রয়েছে। আমি ঝুঁকে পড়তেই মনে হল, ওই তো লাইলি—রক্তাক্ত ঠোঁট বাঁকা করে চাকার তলা থেকে সে তীব্র ঘৃণায় বলে উঠল—'কুকুর, তুমি এখানেও?'

অমনি সরে এলুম। ভিড় ছাড়িয়ে ফাঁকায় যেতেই মনে হল, কোত্থেকে যেন কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ ভেসে পিছু পিছু আসছে। মুখ তুলে কাঠমল্লিকা গাছ খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। নিশ্চয় কোথাও আছে। এখন গ্রীষ্মে শুধু তো শিমুলিয়ার পীরের কবরে কাঠমল্লিকা ফোটে না।

একটা কামরা থেকে কে বলে উঠল—'কী দাদু? দেখলেন! সুইসাইড নাকি?'

জবাব দিলুম না। মাথা ঘুরছিল। বসে পড়া দরকার। খালি

বেঞ্চ খুঁজতে খুঁজতে যত এগোচ্ছি, কাঠমল্লিকা ফুলের সেই গন্ধ আরও তীব্র হচ্ছে, আমার পিছু ছাড়ছে না। পালাতে, পালাতে, পালিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াতে হল। এবার গন্ধটা আমাকে ধরে ফেলেছে। চারদিকে ঘিরে ঝড়ের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। আসঙ্গলিপ্স্‌ বাঘিনীর মতো ফুঁসছে।

তারপর আমার শরীরের রোমকূপ দিয়ে ঢুকে যেতে থাকল গন্ধটা। তখন আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলুম—'না, না, না!'

কেউ এসে আমাকে ধরে ফেলল হয়তো।...

